কোরক

হেরম্বচন্দ্র কলেজপত্রিকা

২০১৬

মেখলা

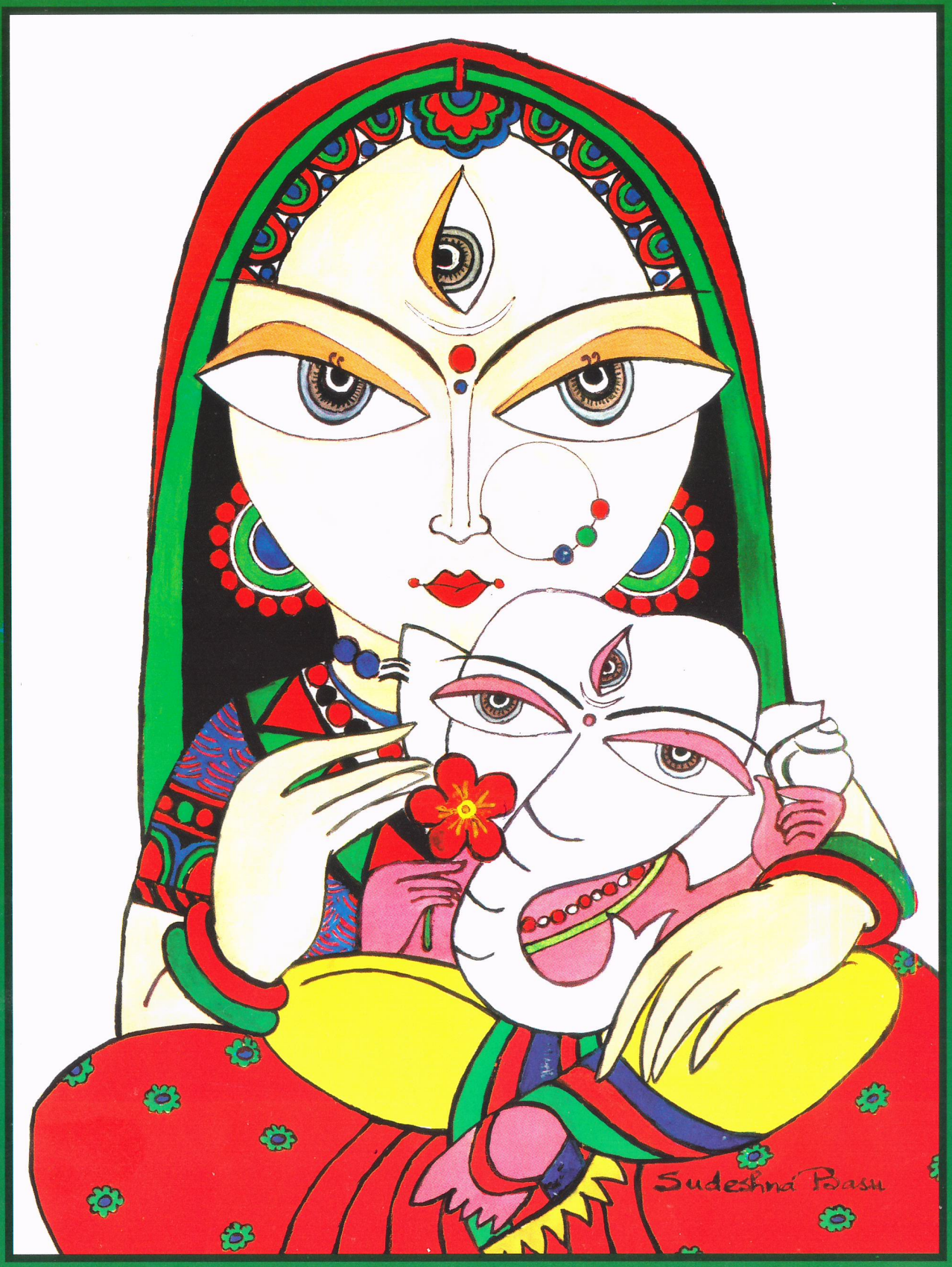

সম্পাদক – অর্ঘ্যদীপ রায়চৌধুরী
সম্পাদনা পর্যবেক্ষণ – অচিন্ত্য মন্ডল, ইতিহাস বিভাগ

কোরক

হেরম্বচন্দ্র কলেজ পত্রিকা

সম্পাদক: অর্ঘ্যদীপ রায়চৌধুরী
ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ

সম্পাদনা পর্যবেক্ষণ: অচিন্ত্য মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ

প্রকাশক:
হেরম্বচন্দ্র কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষে
অধ্যক্ষ ড. নবনীতা চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ চিত্র:
মেখলা ভৌমিক
ছাত্রী, অর্থনীতি বিভাগ

অক্ষর বিন্যাস:
জ্ঞানের আলো
১এ কালিবাড়ি লেন, কলকাতা - ৩২

মুদ্রণ:
রমা দত্ত অ্যান্ড কোং (৯৮৩১৬৭০১৮৮)
৩/১৬৬ গান্ধীকলোনী, কলকাতা - ৯২

কোরক

হেরম্বচন্দ্র কলেজ পত্রিকা

সূচিপত্র

বিশ্বলোকের দ্বারপ্রান্তে
নবনীতা চক্রবর্তী ৫

From the Desk of
General Secretary, Students' Union.
Anirban Dutta ৬

কলেজ শিক্ষা সম্পর্কে কিছু কথা
ইন্দ্রাণী মিত্র ৭

শিক্ষকতার চাকুরি— আরামের নয়, প্রত্যয়ের
অমিত দাশগুপ্ত ১০

ড্রাগ একটি অভিশাপ
গার্গী মুখার্জী ১৩

দ্বিতীয় মৃত্যু
সুভাশিষ বেরা ১৫

পাহাড় কোলে মাদল বাজে
তনুশ্রী হাঁসদা ১৭

সাতশো কোটির স্বপ্ন
অসিদ্বীপ প্রামানিক ১৮

মৃত্যু শতবর্ষে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
রেশমী মিত্র ২০

বেঁচে থাকতে ক্রাভমাগা
জয়দীপ ভট্টাচার্য্য ২২

পার্বতী অটাবলে ও সমসময়:
শিক্ষা, স্বাবলম্বন ও মিশ্র মানসিকতা
উপমা বিশ্বাস ২৪

মনের মুখোমুখি
রাণু ঘোষ ২৭
যুগবিপ্লবের সন্তান শিবনাথ শাস্ত্রী
সবিতা মন্ডল ২৮
অমল আলো
অনন্য শংকর দেবভূতি ৩২
ইতিহাস, ঐতিহাসিক ও প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা
অচিন্ত্য মণ্ডল ৩৮
উন্নয়নের 'অ-রাজনৈতিক' সাম্রাজ্য বিস্তার
অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
কবিতা ৪৯-৫৩
Population Theory – The major views
Indrani Chakraborty ৫৪
The Greek Financial Crisis
Angana Chatterjee ৫৮
The Politics of Exclusion and The Two Mary's –
Mary Wollstonecraft and Mary Shelley
Dr. Lily Law ৬২
IPL - Is it a Boon or Curse for Indian Cricket
Sidhant Das ৬৭
College
Arunima Mondal ৬৮

From the Desk of General Secretary, Students' Union.

Anirban Dutta

College life is somewhere you will see a new world, a world you haven't seen before... So Enjoy!!!!! After completing long 12 years of disciplined school life, college is place to take free breath. This college has a huge contribution in educating people for more than 60 years. It is the first college in South Kolkata which pioneered Commerce education. Gradually, it has spread its branches and now teaches Honours in Bangla, Education, English, History, Political Science in Humanities; and Economics and Geography in Science.

The contribution of Students' Union has been huge in this college. The Students' Union has been able to encourage student in many extra curricular activities and it has formed many clubs like photography Club, Science Club, Painting Club, Drama Club, Nature Club, Trekking and Rock Climbing Club. It has also worked for various welfare for students. The Students' Union also hosted the most successful and organized Fest Hemfluence 2015 after 10 years.

This college is named after Late Heramba Chandra Moitra who was renowned educationist. He was an honest and wise man who wanted all his students to be honest in life. Once someone asked him "Sir where is Star Theater", he said he didn't know. So the student was about to leave. Then Late Heramba Chandra Moitra stopped him and said that he knew where Star Theater was but he wouldn't tell him because if he told, then the student would bunk class and will go to watch theater.

To all the students I appeal live life honestly and never compromise in life as my mentor once said to me. One should always support the right whatever the circumstances is in life. This will help you to succeed in life.

Never feel that politics is not for Educated people because educated people can only change this country and take it to a different level. So join politics and make change. Remember, change is the only constant. Change yourself, change the society, change the world. So if you don't like something only you and you can change it. If you have the will and the courage you can face anything in life. People will always support you if you are correct. And if every one of us start supporting the right.

College life is somewhere you will see a new world, a world you haven't seen before... So Enjoy!!!!!

বিশ্বলোকের দ্বারপ্রান্তে

নবনীতা চক্রবর্তী

কোরক। হেরম্বচন্দ্র কলেজের পত্রিকা। প্রকাশিত হতে চলেছে নতুন করে, নব কলেবরে— অনেকদিন পরে। সম্পাদকমণ্ডলীর বক্তব্য কলেজ অধ্যক্ষের নাকি দু'চার কথা থাকা আবশ্যিক, প্রথা। অগত্যা দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সই করা ছাড়া লেখার জন্য কলম ধরা।

ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় একটি কলেজ সুস্থ-সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। এক তারে বাঁধা এই সুরই সুন্দর মূর্চ্ছনা তৈরি করতে পারে। পরিবার থেকে বিদ্যালয়, তার থেকে মহাবিদ্যালয় এবং তারও পরে বিশ্ববিদ্যালয়— এভাবেই শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের ব্যপ্তি বাড়ে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। শিক্ষার আদতে এটাই লক্ষ্য। কিন্তু আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সব শাশ্বত ভাবনাগুলো যেন উল্টে পাল্টে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আধুনিকতার অবদান আমাদের অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি বিভিন্ন উন্নত থেকে উন্নততর প্রয়োগ মাধ্যমের সাহায্যে। সেগুলি এখন আমাদের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এসেছে গোটা দুনিয়াকে প্রায়— আমাদের মুঠোফোনে, মোবাইলে। সেই মুঠোয় আবার সবচেয়ে প্রিয় গান হয়ে উঠেছে— 'আমাকে আমার মত থাকতে দাও।' আসলে তথাকথিত 'সভ্যতা' মনে হয় বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই শিক্ষা দিতে চায়, হাত প্রসারিত করার পরিবর্তে মুঠো বন্ধ করতে চায়। আমরা তাই প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে যেন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি। এর বিরুদ্ধেই আসলে আমাদের দাঁড়াতে হবে। আজকের ছাত্ররা, মানে তাদের অভিভাবকরা মনে করেন কলেজে ভর্তি করার আগে থেকেই একটা 'পড়া'র ব্যবস্থা করতে হবে। তা হলে কলেজে কী হয়? অভিজ্ঞতা বলে, ছাত্রের কলেজে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে উত্তর হিসেবে নানা অজুহাতের সংযোজন স্বরূপ শুনতে পাওয়া যায় যে, সে কিন্তু পড়াটা কামাই করে না। এর অর্থ কী? ছাত্র-অভিভাবকরা পড়ার স্থান হিসেবে কলেজকে মান্যতা দিতে চান না। কলেজের শিক্ষকদের প্রকারান্তরে অপমান করেন। কারণ তাঁদের যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে করেন না সন্তানদের শিক্ষক হিসেবে। অপরপক্ষে শিক্ষকরা কলেজের শ্রেণীকক্ষ ক্লাস শুরুর কিছুদিন পর থেকেই যখন দেখেন যে খালি বেঞ্চের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তখন মনে হওয়াটা স্বাভাবিক যে, এটা পড়ার জায়গা নয়, 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথাও' আমার পড়ান উচিত। সব মিলিয়ে, সবাই মিলে আমরা শিক্ষাদান এবং গ্রহণ পদ্ধতিকে ক্রমশ গুলিয়ে তুলছি। বৃহত্তর শিক্ষার জন্য যে বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রয়োজন হয় এই মূলের কথাটাই বেমালুম ভুলিয়ে দেওয়া গেছে। তাই আমরা কেবলমাত্র নিজের জন্য ব্যতিরেকে কারোর দুঃখে কাতর হই না, কারোর সুখে আনন্দিত হই না। আমাদের জীবন নীতি— "তোমার হিংসা আমার জয়।" আমাকে দেখে যত মানুষ ঈর্ষান্বিত হয়, ততই আমার অহংকার। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের বিস্তৃত পরিধি প্রকৃতপক্ষে কিছু উদারতার পাঠ পড়ায়। শুধুই কিছু পুঁথিগত শিক্ষা আখেরে কম্পিউটারের মত একটি যন্ত্রই তৈরি করে, জীবনের শিক্ষার জন্য; মানুষ হয়ে ওঠার প্রয়োজনে পঙক্তি ভোজন আবশ্যিক। দশরকম প্রেক্ষাপটের দশজন ছাত্রের সান্নিধ্যেই নানা স্বাদের আস্বাদন নেওয়া সম্ভব হয়। প্রকৃতি যেখানে সাতরঙা রামধনু উপহার দিয়েছে সেখানে কেন সে সব রং ফিরিয়ে দিয়ে আঁধারের পথে দৃষ্টি হারাবো? 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'।

প্রথাগত শিক্ষার বাইরে কলেজটা হয়ে উঠুক সংযোগ স্থাপনের এক মহাক্ষেত্র। মনের নানা ভাবনা চিন্তা বিকাশের একটা মাধ্যম এই 'কোরক'। এখানে কলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের সমান অধিকার। হয়তো এখানেই বীজ বপন হবে ভবিষ্যতের কোনও চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, কবি বা শিল্পীর। হোঁচট খেয়ে আর নয়, আমার বিশ্বাস এবার থেকে কোরকের চলার পথ হবে মসৃণ। এর বাহু প্রসারিত হবে ঊর্ধ্বপানে, অঙ্গীকারে দৃঢ়বদ্ধ হবে মুষ্ঠি, অনুভবে শিথিল করবে মুঠি। সকলের উৎসাহে এবং সহযোগিতায় তা একদিন পরিণত হবে পান্থপাদপে।

অধ্যক্ষ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ

কলেজ শিক্ষা সম্পর্কে কিছু কথা

ইন্দ্রাণী মিত্র

শিক্ষক জীবনের উপান্তে এসে যে চিন্তা মাথা থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারি না--- তা হল ছাত্রদের কাছে কলেজশিক্ষার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বহীনতা। কলেজে ভর্তি হয়ে অনেক ছাত্রছাত্রীই আর ক্লাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। স্কুল জীবনের তুলনায় কলেজ জীবনে একটু বেশি স্বাধীনতা সর্বজনস্বীকৃত। কলেজে ক্লাস কাটা প্রক্সি দেওয়ার রেওয়াজ বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু বর্তমানে কলেজে উপস্থিতির হার বিপজ্জনকভাবে কমে আসছে। কেউ কেউ কলেজে ভর্তি হয়ে চাকরিতে যোগ দেয়, কেউ বা সারাবছর খেলে বেড়ায়, কেউ বা পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নেয়। তারা কলেজে যথাসময়ে ভর্তি হয় আর পরীক্ষার সময় দেখা দেয়। এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আরেক দল আছে যারা এতটা সাহস দেখায় না। কলেজে রোজ আসে না, মাঝে মাঝে আসে। এদের সংখ্যা বেশ বেশি। এদের দেখা যায় বিশেষত বাণিজ্য বিভাগের ক্লাসে। কলা বা বিজ্ঞান বিভাগে এদের দেখা মেলে না, এমন নয়, তবে সংখ্যা কম। আর এক দল আছে যারা রোজ ক্লাস করে। এদের অনুপাত কলা বা বিজ্ঞান বিভাগে বেশি বাণিজ্য বিভাগের তুলনায়। সামগ্রিক বিচারে ছাত্র উপস্থিতির হার কম। প্রশ্ন হল, এরা স্কুলে ক্লাস করে, কলেজে করে না কেন? কলেজে স্বাধীনতা বেশি, কর্তৃপক্ষের আলগা রাশ দেখলে তারা তার সদ্ব্যবহার করে।

কিন্তু কলেজে যারা ক্লাস করে না প্রাইভেট কোচিং-এ তারা কিন্তু নিয়মিত যায়। সেখানে না গেলে কেউ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে না। তাহলে নিশ্চয় তারা কলেজের পড়ার থেকে প্রাইভেট কোচিং-এ যাওয়া বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। কেন?

প্রাইভেট কোচিং-এ তারা নোট পায়, কলেজের টেক্সট বই বা রেফারেন্স বই পড়ার দরকার হয় না। নোট কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। যে নোট বোঝে না, সে বই পড়েও বুঝত না। কিন্তু সুবিধা হল নোট পড়ে না বুঝলে মুখস্ত করে উগরে দেওয়া যায় কিংবা মাইক্রোজেরক্স করে টুকে দেওয়া যায়, সেখানে বই থেকে না বুঝে, না পড়ে টোকা শক্ত। নোট মুখাপেক্ষিতা এক ভয়ংকর প্রবণতা। নোটের বাইরে কিছু জানা যায় না। কোনবার হাতির দাঁত সাজেশনে থাকলে হাতির দাঁত পড়া হয়, যেবার হাতির শুঁড় সাজেশন, সেবার হাতির শুঁড় সম্পর্কে জানা হয়। কোন দিন হাতি সম্পর্কে জানা হয় না।

এই বিপজ্জনক প্রবণতা কাটাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্নপত্রের ধাঁচ পাল্টাচ্ছে। ছোট ছোট প্রশ্ন, ধারণাভিত্তিক প্রশ্ন করছে। ফলে নোটের আকর্ষণ কমছে। কিন্তু তাতে প্রাইভেট কোচিং-এর নির্ভরতা কমছে না কেন?

প্রাইভেট টিউশনের ওপর এই নির্ভরতা ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়। বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে কোচিং চলে নামী-দামি স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য। তারপরেও সেই কোচিং চলে দশ বা বারো ক্লাসে ভাল রেজাল্ট করার জন্য, তার পরে ডাক্তারি-ইঞ্জিনীয়ারিং বা প্রিমিয়ার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটে ভর্তি হওয়ার জন্য। এমনকি ডাক্তারি বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেও চলে টিউশন। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রাইভেট টিউশন নিলেও তারা সেটা যায়, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নয়। দশ, বারো ক্লাস তারা স্কুলে পড়ে। স্কুলে অনুশাসন বেশি। তাই স্কুলে তেমন কামাই করতে পারে না। ডাক্তারি বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, কলেজ পরীক্ষা নেয়, তার ফলাফল ছাত্রদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। তাই সেখানেও হাজিরা দেয়। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত কলেজ আছে, তারা কলেজে যে পরীক্ষা নেয় বা খাতা দেখে তা ছাত্রদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করে না বলে ছাত্রছাত্রীরা তাকে অবজ্ঞা করে। এ ব্যাপারে স্বায়ত্বশাসিত কলেজগুলি কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে কড়াকড়ি না করলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী কলেজমুখী হতে চায় না, বিশেষতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে।

আসলে কলেজ শিক্ষার কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে।

(১) সময়ের অভাব ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন বছরে ছটি পরীক্ষা নেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিয়ে শুরু আর বিএ/ বিএসসি পার্ট ওয়ান পরীক্ষা দিয়ে শেষ। এই ছটি পরীক্ষা শেষ করতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই মাস গড়িয়ে যায়। আমাদের মত কলেজ, যেখানে এক বিল্ডিং-এ তিনটি কলেজ হয়, সেখানে বিল্ডিং-এ সব কটি পরীক্ষার সীট পড়ে। সবচেয়ে

অর্থনীতি বিভাগ

ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুপুরের কলেজ। এপ্রিল মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার জন্য থাকে পাঁচ মাস কারণ জানুয়ারীতে টেস্ট। পাঁচ মাসের মধ্যে আবার পূজোর ছুটি। চার মাসে চারটি পেপার পড়ানো বা ধারণা তৈরী করা প্রায় অসম্ভব। কোচিং ক্লাসে তারা পরীক্ষার পরপর ভর্তি হয়। তারা কলেজের তুলনায় অনেক বেশি সময় পায়।

(২) সিলেবাসের বোঝা: কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি সময় পায়, প্রায় ছ মাস। সিলেবাসের বোঝাও সবচেয়ে কম। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে অনার্সের বোঝা বেশি, সময় কম। কলেজে ছুটিছাটা বেশি। তারপর ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয় তৃতীয় বছরে কলেজে আসা বেশ কমিয়ে দেয়। ক্লাসে যে কজন ছাত্র উপস্থিত থাকে, তাদের কম্পোজিশন রোজ পাল্টে যায়। ক্লাসে কোন নতুন বিষয় শুরু করলে সেটাকে নিয়ে এগোতে অসুবিধা হয়, কারণ পরের দিন ক্লাসে বেশ কিছু অন্য মুখ দেখা যায়। সিলেবাস শেষ করার তাগিদে আগের দিনের পড়ার পর থেকে শুরু করলে বেশ কিছু মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তারা কিছু বুঝছে না। এ অবস্থায় শিক্ষককে কিছুটা পুরানো পড়া আবার বলতে হয়। ছোট ক্লাসে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত বেশি হওয়ায় তাদের বকে ধমকে ক্লাসে নিয়মিত আনা যায়। বড় ক্লাসে এই প্রবণতা চলতে থাকে। তাদের বিকল্প পড়ার ব্যবস্থা থকাতে তারা কিছুমাত্র বিব্রত হয় না।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে ছাত্র উৎসাহ হারিয়ে ফেললে কলেজ শিক্ষকদের অস্তিত্ব নঞর্থক হয়ে পড়ে। ছাত্রদের কলেজমুখী করার জন্য আমাদের শিক্ষকদের একটু উদ্যোগী হওয়া দরকার। শুধু শিক্ষকের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নয়, প্রাইভেট টিউশন যে সবসময় ছাত্রদের পক্ষে ফলপ্রসূ হয়, তাও নয়। অনেক সময় পরীক্ষার খাতা দেখে বোঝা যায় না, তারা পলেজ বা প্রাইভেট টিউশন, কোথাও কিছু পড়াশুনা করেছে কিনা। তারা পড়াশুনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। আগে কলেজ পরীক্ষার খাতায় শূন্য খাতা বা হাবিজাবি লেখা খাতা পাওয়া যেত। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতাতেও এমনটি পাওয়া যাচ্ছে। পড়াশুনায় এই অনাগ্রহ একদিনে হয় না। না পরিবার, না প্রাইভেট টিউশন, না আমরা কলেজ শিক্ষকরা তা লক্ষ্য করি। বছরের পর বছর তারা পরীক্ষায় বসে, পাশ করতে পারে না। ছাত্রসংখ্যার আধিক্য বাণিজ্য দেয় ঠিকই, কিন্তু ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কে দূরত্ব এনে দেয়। কিন্তু আমাদের তো এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে কাম্য সমাধান বার করতে হবে। ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা বা পাঠ্য বিষয়ে উৎসাহ বা ধারণা তৈরী করা শিক্ষকের কর্ত্যব্যের মধ্যে পড়ে। এ উদ্যোগে সফল হতে হলে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে আসা এক আবশ্যিক শর্ত। সেক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য দরকার। কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষায় পাশ করা আর ন্যূনতম উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে পারে। জোর করে ওষুধ গেলানোর মত পড়াশুনা করানো যায় না, সেটা ঠিক। কিন্তু রাশ পুরো আলগা করলে সেখান থেকে ফেরা শক্ত।

রাতারাতি সব ছাত্রছাত্রীকে কলেজে এনে ফেলা যাবে না। যারা নিয়মিত ক্লাসে আসে, তাদের দিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষামূলক উদ্ভাবনী পদ্ধতি বের করতে হবে যার মাধ্যমে দুটো জিনিষ প্রতিষ্ঠা করা যায়। কলেজে ক্লাস করা জরুরী, তাতে তারা লাভবান হবে আর কলেজের শিক্ষকেরা তাদের শুধু ঘন্টা মেপে পড়ানো নয়, তাঁরা তাদের সবরকম সাহায্য করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। প্রথম শুরু করতে হবে যারা নিয়মিত কলেজে আসে, তাদের সুফল পাইয়ে দিয়ে। যারা মাঝে মাঝে আসে, তারা এই সুফল দেখলে কলেজে আসায় উৎসাহী হবে। কিন্তু যারা কলেজে একেবারেই আসে না, তাদের কর্তৃপক্ষকে জোর করতে হবে আসার জন্য। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, তারা কোন কারণে পড়াশুনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তাদের কাউন্সেলিং করিয়ে পড়াশুনায় কেন উৎসাহ নেই, তা বার করতে না পারলে শুধু ধমকানিতে পুরোপুরি মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা হয়তো সম্ভব নয়।

কলেজ শিক্ষকের তরফ থেকে যে কর্মসূচী নেওয়া উচিত, তা হল

(১) সিলেবাসের পড়ার পাশাপাশি ছাত্রদের পড়ায় উৎসাহী করার জন্য পাঠ্যবিষয়ের সম্পর্কিত তথ্য আরও দিতে হবে। তত্ত্বের প্রয়োগের বাস্তব উদাহরণ দিতে হবে। পাঠ্যবিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে তোলা শিক্ষকের দায়িত্ব।

(২) শুধু একঘেয়ে বক্তৃতা নয়, ছাত্রদের সঙ্গে ধারণার আদানপ্রদান করতে হবে।

(৩) ক্লাসে নোট পড়া (ডিক্টেট্) করা চলবে না। বর্ণনামূলক বিষয়ে পাঠ্যবইগুলির বাইরে কোন নোট দেওয়ার থাকলে তা দেওয়া যেতে পাড়ে, কিন্তু ক্লাসে বিষয়টি আলোচনা করতে হবে। ছাত্রদের নোট না পড়ে জমিয়ে রাখার একটা প্রবণতা থাকে। পরীক্ষার আগে সেগুলি একসঙ্গে খুলে বসলে ভয়ানক অবস্থা হয়।

(৪) ছাত্রদের বিষয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে, মাঝে মাঝে সেমিনারের আয়োজন করে।

(৫) ক্লাসে যেসব ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তাদের আলাদা ক্লাস নিতে হবে।

(৬) কলেজে সব ছাত্র পণ্ডিত হতে আসে না। যারা পাশ করে চাকরি পেতে চায়, তাদের ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা, প্রফেশনাল লোককে দিয়ে কেরিয়ার কাউন্সেলিং করতে হবে।

(৭) পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের আরও যেসব গুণ আছে তার বিকাশ ঘটাতে হবে কলেজে বিভিন্ন সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

(৮) ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

তাদের ভরসার জায়গা হতে হবে, যাতে তারা তাদের যেকোন সমস্যা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে।

(৯) শিক্ষককে ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। সিলেবাস শেষ না হলে টেস্টের পরে বাড়তি ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। তাতেও সিলেবাস শেষ করা সম্ভব না হলে তুলনামূলকভাবে কঠিন অংশ পড়িয়ে সেইসঙ্গে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নগুলি ক্লাসে কিছু কিছু করিয়ে দিয়ে, কিছু আলোচনা করে দিতে হবে। ছাত্রদের হাজিরা ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্রদের সঙ্গে নিয়মিত মতের আদানপ্রদান করতে হবে আর নিয়মিত ছাত্রদের ফিড-ব্যাক নিতে হবে।

ছোট ছোট বিভাগগুলিতে এই পদ্ধতিগুলি অনেকটাই চালু আছে, কারণ ছাত্র সংখ্যা কম বলে। বড় ক্লাসগুলিতে উপস্থিতির হার বাড়ানোর চেষ্টা চলছে, বিরাট ফলপ্রসূ হয়েছে--- এমন কথা বলা যাবে না। তবে চেষ্টা ছাড়লে চলবে না। ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট আর কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করা গেছে। ইচ্ছুক ছাত্রদের যোগদান বাড়ছে, তবে আরও বাড়া দরকার। পড়াশুনা ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যাপারে এই কলেজে অনেক প্রতিভা আছে। নানারকম খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় এ কলেজ বহুদিন জিতেছে, সুনাম অর্জন করেছে। নিজস্ব খেলার মাঠ না থাকায় কলেজের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করা সম্ভব হয় না। সাংস্কৃতিক মঞ্চে কলেজের কুশীলবদের আত্মপ্রকাশের জায়গা করে দেওয়া করে দেওয়া হচ্ছে, যেটা আগে একেবারেই ছিলনা। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই ধরণের যোগাযোগ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক বাড়াতে সাহায্য করে। কিছুটা হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেকটা পথ বাকি।

শিক্ষকতার চাকুরি— আরামের নয়, প্রত্যয়ের

অমিত দাশগুপ্ত

তিরিশ বছর আগে হেরম্বচন্দ্র কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার আগের ৪ বছরে ৬টি কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করা হয়ে গিয়েছিল। ফলে পরিবারের অনেকেই সন্দিহান ছিলেন এই কাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে। কেবল আমার এক বন্ধুর বাবা বলেছিলেন, "বুড়ো, মনে হচ্ছে এটাই তোর ঠিক জায়গা।" কেন বলেছিলেন সে ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই বলা যায়, কথাটা ফলেছে। কলেজে যোগদানের পরে গোড়ার দিকে চাকুরির জন্য দরখাস্ত করার ঝোঁক বজায় ছিল, কয়েকটি জুটেও গিয়েছিল। তবে পাল্টানো হয়ে ওঠেনি। তাই কিঞ্চিদধিক তিন দশক কাজ করার পরে অবসর নেব এই কলেজ থেকেই।

হেরম্বচন্দ্র কলেজে বন্ধুদের অনেকেই পড়েছে। অন্যতম কারণ আমাদের বাসস্থান ঢাকুরিয়ার নিকটতম এই কলেজ, যাকে আমরা সাউথ সিটি ডে কলেজ হিসেবেই জানতাম। ২৩ এপ্রিল, ১৯৮৬, যেদিন কাজে যোগদান করি, কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল। যোগদান করে জানতে পারি, কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন চলছে। তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, এবং তিনি তৎকালীন শাসক দলের মদত পাচ্ছেন। পরীক্ষা চলাকালীন জানা যায় তিনি আদালত থেকে সাময়িক বরখাস্তের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ পেয়ে কলেজে আসছেন। যতদূর মনে পড়ছে ৩০ এপ্রিল পরীক্ষা চালাকালীন তিনি কলেজে আসেন। ফলে, শিক্ষক সংসদ ১ মে সভা ডাকে। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে শিক্ষকেরা পরীক্ষায় নজরদারি ও ক্লাস বয়কট করবেন। তবে এও বলা হয় যে, নতুন যারা যোগদান করেছেন, সব মিলিয়ে ৬ জন, তাদের সেই বয়কটের আন্দোলনে যোগ না দিলেও চলবে। তবে ওই ৬ জনও নিজেদের ইচ্ছায় অন্য সমস্ত শিক্ষকদের সাথে বয়কটে যোগ দিয়েছিলেন। এ দিকে ৩০ তারিখ বেতন হয়ে গিয়েছিল। যোগদানের পরে বেতন (মাসিক ১৭০০ টাকা) স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত মাসে ১০০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হত। সেই হিসেবে এপ্রিল মাসে ২৫০ টাকার চেক পেয়েছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ মহাশয় পুনরায় যোগ দিয়ে আগের চেকগুলিকে বাতিল করেছেন। ফলে ওই সব চেক ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে। কাজে যোগ দিয়েই বেতনহীন হয়ে পড়লাম। ছেড়ে আসা কাজের বেতন ছিল মাসিক ৩০০০ টাকা। ইতিমধ্যে কলেজের শিক্ষকেরা কলেজ গেটে অবস্থান করতে শুরু করেছেন ও সেখান থেকে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। তখন কলেজে ছাত্র পরিষদের ছাত্র সংসদ। যেহেতু অধ্যক্ষের পক্ষে তৎকালীন শাসক দল সিপিআইএম, তাই শত্রুর শত্রু হিসেবে ছাত্র পরিষদ শিক্ষকদের মিত্র। তাই ছাত্রদের তরফ থেকে কোনও অসুবিধে ছিল না। কলেজ গেটে অবস্থান করে একদিকে অধ্যক্ষের কলেজে ঢোকায় বাধা সৃষ্টি করাও হত, আবার অন্যদের দৃষ্টিও আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হত। লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, ঘেরাও না করে ছাত্ররা যে অবস্থানের মাধ্যমে শিক্ষকদের ঢোকা বেরোনোয় বাধা দেয়, সেটাই তো আমরা করেছিলাম তখন। এভাবে চলার পরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পরিচালন সমিতিকে বরখাস্ত করে প্রশাসক নিয়োগ করে। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি উচ্চ আদালতে যায়। সব শেষে তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. সুবোধ চৌধুরী অন্য কলেজে চলে যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসক নিয়োগের নির্দেশ আদালত কর্তৃক বাতিল হয়। ফলে শিক্ষকদের সেই আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। কেউ যদি জানতে চায়, সদ্য কলেজে যোগদান করা একজন শিক্ষক কেন একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিল? গ্রহণযোগ্য কারণ না জানাতে পারলেও, উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। প্রায় সমস্ত সহকর্মী যখন একযোগে সেই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তখন ঐক্যবদ্ধ সেই আন্দোলনের সাথে থাকাটাই কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির যুক্তিসম্মত আচরণ। যদি আন্দোলনের পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে বলে অবহিত থাকা যেত তাহলে সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিরোধিতা করা হত উচিৎ কাজ। সেখানে অতিসংখ্যালঘু কণ্ঠস্বরও ইতিবাচক হয়ে উঠত। অধ্যক্ষ অপসারিত হওয়ার পরে আমরা বর্তমান শিক্ষক কক্ষে ফিরলাম। বলতে ভুলে গেছি, এর মধ্যে আমরা আদালতের নির্দেশে বেতন পেতে ও কলেজের নীচের তলায় একটি ঘরে (বর্তমানে রেক্টরের ঘর) বসতে শুরু করেছি। আরেকটি ব্যক্তিগত কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে। বেতন হীন অবস্থা চলাকালীন বিয়ে করেছি মে, ১৯৮৬-তে। এখন ভাবলে শ্বশুর বাড়ি ও স্ত্রীর অবস্থা কল্পনা করে

অর্থনীতি বিভাগ

নিজেই বিব্রত হচ্ছি। বিবাহ নিবন্ধীকরণের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সময়ে পাত্র কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের পদস্থ কর্মচারী, বিয়ের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করার সময়ে সেই চাকরি ছেড়ে কলেজে অর্ধেক বেতনে যোগ দিচ্ছে আর বিয়ের সময়ে বেতন পাওয়ার বিষয়ে কোনও নির্দিষ্টতা নেই।

কলেজে যোগদানের অব্যবহিত পরেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার কথা দিয়ে শুরু করলাম এই জন্যই যে, কলেজে পড়ানোকে যারা সার্বিক শান্তির কাজ বলে মনে করেন তাঁদের জ্ঞাত করা মাথা উঁচু করে কাজ করতে গেলে নিজস্ব স্বার্থকে কিছু মাত্রায় ছাড়তে হয়। কলেজ জীবনে ঝঞ্ঝাট এখানেই শেষ নয়। পড়ানোর পাশাপাশি কলেজের অন্যান্য কাজে ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলাম প্রথম থেকেই। বছর দুয়েক আগে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করা ড. প্রশান্ত শর্মার সঙ্গে এক নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে। বহু ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনায় পার্থক্য থাকলেও সেই বন্ধুত্ব ছিল একদম নিঃস্বার্থ। কলেজের যে কোনও আন্দোলন লড়াইয়ে দুজনে একসাথে থেকেছি। আমাদের দুজনকে যথেষ্ট কম অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও কলেজের যুগ্ম শিক্ষা অধিকর্তা (একাডেমিক সুপারিন্টেন্ডেন্ট) করা হয়। প্রশান্ত শিক্ষক সংসদের সম্পাদকও ছিলেন। বছর দু' এক বাদে অজানা কারণেই তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক (শ্রীঅমিতাভ বসু) আমাদের উপরে বিরক্ত হন। সেটি প্রকট হয় শিক্ষক সংসদের সম্পাদক নির্বাচনের সময়ে। সাধারণত, এ বিষয়ে সকলের সাথেই কথা বলেই সম্পাদক সর্বসম্মতি ক্রমে বাছা হত। সম্ভবত, ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের আগে লোকমুখে জানতে পারি তিনি এ ব্যাপারে অন্য একজনের (শ্রীরামপ্রসাদ রায়) নাম ভাবছেন ও তাঁর হয়ে প্রচার করছেন। সম্পাদক নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম নির্বাচনের জন্য ডাকা সভাতেই চাওয়া হয়। যাই হোক আমরা কয়েকজন ঠিক করি, নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে, হারলেও। বুঝতে পারি, হারাটাই স্বাভাবিক। কারণ রামপ্রসাদবাবু শাসক দলের শিক্ষক নেতা, ততদিনে এসএফআই ছাত্র সংসদ দখল করেছে। ফলে অমিতাভদা মন ও দল পাল্টেছেন। আরেকপ্রস্ত লড়াই সেই দিন থেকেই জারি হয়ে যায়, যা বহুকাল চলেছে। নির্বাচনে ৩ ভোটে হেরে যাই। দুজনেই একাডেমিক সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়াই। এর পরে অমিতাভদা আরও ৮ বছর ওই পদে ছিলেন, আমাদের লড়াইও জারি ছিল। এতদসত্ত্বেও কলেজের বিভিন্ন কাজে যতদূর সম্ভব সহায়তা করেছি, আমরা দুজনেই। এটাও মানতে হবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মুখোমুখি আমাদের কথার বিরোধিতা করতেন না। তবে ক্রমাগত তিনি শাসকদের সঙ্গে নৈকট্য বাড়াতে থাকেন। ফলে ছাত্র সংগঠনের বহু অযৌক্তিক আবদারকে মেনে চলেছেন। অনেক সময়ই এক একটি শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা ২৩০-২৪০-এ পৌঁছাত, এসএফআই-এর চাপে। তিনি এটা জানতেন, যাদের সাহায্য প্রায়-রাজনৈতিক কারণে তিনি নিচ্ছেন, তাঁরা পরিশ্রমী কাজের ক্ষেত্রে হাত গুটিয়ে নেবেন। ১৯৯৬-এর স্কেলে বেতন পুনর্বিন্যাসের সময়ে, ১৯৯৯-২০০০ সাল নাগাদ, বেতন স্থিরীকরণ ও বকেয়া বেতনের দাবি হিসাব করে পেশ করার সময়ে, মনে পড়ে যাচ্ছে, তিনি প্রথমে আমাদের বাদ দিয়ে অন্যান্যদের উপরে দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। কিন্তু শেষে, নবাগত সুবীরের সহায়তায় তা যথাযথ সময়ে পেশ করতে সক্ষম হই। তাই ২০০৩ সালে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায় জোর করে ন্যাকের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। আবার সলিলদা, সুবীর, প্রশান্তর সহযোগিতায় ন্যাকের পরীক্ষা উতরে যাই, ভালভাবেই। ২০০৫ সালে সেই দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করার পরে যখন ২০০৬ সালে তিনি অবসর নিচ্ছেন, আবার তিনি শাসক দলের রাজনীতির চাপে পড়লেন। অন্য দিকে প্রশাসনিক দায়ভার বণ্টনের দায়িত্ব, যা পরবর্তী ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের (শ্রীসলিল বিশ্বাস) কাছে যাওয়া উচিত, তা তিনি নিজের আয়ত্তে নিয়ে সেই সব নিয়োগেও নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন, পরিচালন সমিতির বৈঠকে প্রশান্ত ও সলিলদা যখন বিরোধিতা করেন, তখন এসএফআই একজনকে সহ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতে বাধ্য করে। সহ-অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনের নাক গলানোর নিদর্শন তৈরি হয়।

সলিলদা অল্প কিছুদিন কাজ করার পরেই বুঝতে পারেন যে, শাসক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রেখে তাদের মতানুযায়ী কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এ ছাড়াও বিদায়ী জন নিজের ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে অবসর নিতে নারাজ। ফলে ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালন সমিতির সহযোগিতায় কলেজের প্রশাসনিক ব্যাপারে দূর থেকেই তিনি নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে যেতে চান। ফলে সলিলদা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পদত্যাগ করেন। এর পরে যিনি ওই পদে আসেন, তিনি সে অর্থে আমাদের বন্ধু, কিন্তু মূল শাসক দলের সহযোগী অন্যতম শাসক দলের সদস্য। প্রথম দিকে তিনি কিছু স্বাধীন চিন্তার উদাহরণ দেখালেও, অল্প কিছুদিন পরেই পূর্বতন পদ্ধতিতে ফিরে যান। শিক্ষকদের মধ্য থেকেও কিছু তাঁবেদার জুটিয়ে ফেলে কলেজের পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তোলেন। কেবল তাই নয়, আমাদের সংস্পর্শে থাকা বা ঘনিষ্ঠ শিক্ষকদের সঙ্গে অসঙ্গত ব্যবহারও শুরু হয়। তিনিও শ্রীঅমিতাভ বসুর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন বা তাঁকে তা করতে বাধ্য করা হয়। কলেজের শিক্ষক সংসদের মহিলা সম্পাদককে (শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত) বিভিন্নভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করা শুরু হয়। আমরা ৭ জন, প্রশান্ত, ইন্দ্রাণী, নবনীতা, রীণা, শর্মিষ্ঠা (দাশগুপ্ত), সুবীর ও আমি সরাসরি লড়াইয়ে নেমে পড়ি। তৎকালীন সম্পাদককে (বর্তমানেও) বেআইনিভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করে অপসারিত করেন খগেনবাবু, যা করার কোনও এক্তিয়ারের বিন্দুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাচুটে উল্লেখ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েবকুটা, ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি, ডিপিআই সর্বত্র আমরা ৭ জন ঘুরে বেড়াই, কোনও রাজনৈতিক সংশ্রব ছাড়াই। কিন্তু সকলে মুখোমুখি যুক্তিকে

মানলেও কোনও কিছু করতে নারাজ। কলেজের পড়াশোনার অবস্থাও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। পুরো একটি বছর কলেজে কোনও ক্লাস রুটিন ছিল না। তাতে অবশ্য কারো কোনও ভ্রূক্ষেপও ছিল না। কলেজের ছাত্র সংগঠন (২০০৪ সাল থেকে আইনী কারণে ছাত্র সংসদ ছিল না) হিসাবে এসএফআই নিজেদের অংশ বুঝে নিচ্ছে। সাথে তৎকালীন তৃণমূলের সাথে থাকা ছাত্ররাও তাল মেলাচ্ছে। একদম ডামাডোল। ইতিমধ্যে ২০১০ সালে ২০ সেপ্টেম্বর কলেজে পেট্রল ঢেলে অধ্যক্ষকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছে বলে রটানো হল, যা সর্বৈব মিথ্যা। সারা রাজ্য জুড়ে তা রটানো হল। নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তৎকালীন শাসক দল সে প্রচারকে সর্বত্র নিয়ে যেতে কসুর করেননি। অবশ্য তার আগেই বহু ঘটনা ঘটেছে কলেজ প্রশাসনে। অনেক প্রচেষ্টার দ্বারা তৎকালীন পরিচালন সমিতির সভাপতির (শ্রীঅসিত দাস) সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও তার উপদেষ্টা শ্রীঅমিতাভ বসুর বিরোধ বাধান গেছে। ফলে খগেনবাবুর বিরুদ্ধে সভাপতি তদন্ত চেয়েছেন। তদন্তের ফলে সভাপতি পদত্যাগ করেছেন। ব্রাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি শ্রীঅধিকারীকে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত করার নির্দেশ জারি করেছে। তিনি আদালতে গেছেন। পুনরায় অসিতবাবু, অমিতাভদা ও খগেনবাবুর মিল হয়েছে, সঙ্গে একজোট হয়েছেন ব্রাহ্ম সমাজ এডুকেশন সোসাইটি তথা পরিচালন সমিতির আর একজন সদস্য (শ্রীসুপ্রিয় বসু), যাঁর সঙ্গে এত দিন অসিতবাবুর সাপে-নেউলে অবস্থান ছিল, যিনি কংগ্রেসীও বটে। রাজ্যে বর্তমান জোটের আগেই কলেজে সেই জোট হয়ে গিয়েছিল। তিনি অদ্ভুতভাবে পরিচালন সমিতির সভাপতি হয়েও গিয়েছিলেন। এই পুরো সময় জুড়ে, ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সপ্তরথী এককাট্টা থেকেছি। অনেক আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও হাল ছাড়িনি। যে লড়াইয়ের সূত্রপাত ছিল শিক্ষক সংসদের সম্পাদকের লেখা একটি চিঠি, যেটি তিনি শিক্ষক সংসদের পক্ষ থেকে শ্রীঅসিত দাসের ভর্তি বিষয়ে অনধিকার চর্চা সম্পর্কে লিখেছিলেন, যে চিঠি শ্রীঅধিকারী নিজে দেখে স্বল্প সংশোধন করে নিয়েছিলেন, যে চিঠি প্রত্যাহার করার জন্য চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, শিক্ষক সংসদের সভায়, বেশ কিছু শিক্ষকের মেরুদণ্ডহীন আচরণের ফলে যে চিঠিকে প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু সম্পাদক মাথা উঁচু করে রেখে ক্ষমা চাইতে অসম্মত হন; যার ফলে ওয়েবকুটার নেতাদের উপস্থিতিতে সৌহার্দ্যমূলক বোঝাপড়ার সভায় তাঁকে অপদস্ত করার চেষ্টা চলে, সেই লড়াই ৭ জন লৌহদৃঢ়ভাবে চালিয়ে যায় তিন বছর। সেই ন্যায্য লড়াইয়ে পাশে ছিলেন বিএসইএস-এর সম্পাদক শ্রীসমীর দাস, শ্রীমতী কুমকুম ব্যানার্জী ও অন্যতম সদস্য ড. সুদক্ষিণা কুণ্ডু মুখার্জী। সব শেষে ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে নতুন পরিচালন সমিতি গঠিত হয়, তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি প্রয়াত প্রসূন রায়ের সভাপতিত্বে। কোনও অদৃশ্য কারণে তাঁকেও অপদস্ত করার চেষ্টা চলতে থাকে প্রতিষ্ঠিত এসএফআই ও কিছু তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের দ্বারা একযোগে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের নিরস্ত করেছিলেন। এর পরে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হন প্রশান্ত শর্মা। পরবর্তী লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়, কলেজের সুনাম ফেরানোর, কলেজকে সুন্দর গোছানো করার কর্মসূচি। সে কাজটাও কম বিপজ্জনক নয়। তবুও স্বস্তির বিষয় এই যে, গত কয়েক বছরে কলেজের পরিস্থিতি অনেকটাই সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়েছে। ওই ৭ জনের মধ্যে প্রশান্ত ও রীণা অবসরগ্রহণ করেছে।

উপরে যা লিখলাম তা পড়ে মনে হতে পারে ৭ জন না পড়িয়ে, অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন না করে কেবল বিরোধ করেছে। বাস্তব বিপরীত। প্রশান্ত, ইন্দ্রাণী, নবনীতা, শর্মিষ্ঠা, সুবীর বা রীণা প্রত্যেকেই নিজেদের পড়ানোর ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস। অসম লড়াইয়ের প্রতিটি পর্যায়ে বহু সময়ে ভিতর থেকে রক্তাক্ত হলেও মানসিক বিষাদের ছাপ তাঁরা কখনও নিজেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার উপরে পড়তে দেয়নি। শিক্ষকদের বিরোধিতার কোনও পর্যায়েই ছাত্রদের যুক্ত করা হয়নি, তাদের ঘুঁটি করে চাল চালা হয়নি, প্রতিপক্ষ নিন্দনীয়ভাবে সেই ধরনের আচরণে লিপ্ত হলেও।

বহু বছর পরে কলেজ ম্যাগাজিন বের হচ্ছে। কী লিখি লিখি ভাবতে লিখেই ফেললাম কিছু কটু সত্য কথা। যদিও শাস্ত্রে বলা আছে, শতং বদ মা লিখ; কিন্তু লেখার জন্য মাকে পাবো কোথায় (তিনি তো কবেই গত হয়েছেন)? তাই নিজেই লিখে ফেললাম, পড়ে অনেকেই গালি দেবেন জেনেও।

ড্রাগ একটি অভিশাপ

গার্গী মুখার্জী

মা সোফায় শুয়ে ছিলেন— চোখটা একটু লেগেও এসেছিল। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে এলিনা ডেকে উঠল, ''মা, জল।'' এলিনার মা আয়ূষী পাশের ঘরের জানালার কাছে গিয়ে কপাটটা একটু ফাঁক করে দেখল, মেয়ে বিছানায় আধো চোখে একটু উঠে বসেছে। আয়ূষী জানলা খুলে, জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল এলিনার দিকে। ও উঠে গ্লাসটা নিতে চাইল কিন্তু পারল না, পড়ে গেল বিছানা থেকে নামতে গিয়ে। মাথায় চোট লেগে রক্ত ঝরে পড়ল খানিকটা। মেয়ের দুরবস্থা দেখে মা-র হাত থেকে জলের গ্লাসটা পড়ে ভেঙে গেল। আয়ূসী ছুটে গিয়ে দরজা খুলে ঘরে গেল, মেয়েকে কোলে নিয়ে ওর ক্ষতে একটু অ্যান্টিসেপ্টিক লাগিয়ে দিল। মা, মেয়ে দু'জনের চোখে জল এল।

আগের দিনগুলো কী ভালোই না ছিল! আয়ূষী ভাবে। এলিনা বিকালে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে মাকে জড়িয়ে ধরে বলত, ''মা খিদে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি খেতে দাও।... মা জানো, আজ ইউনিভার্সিটিতে কি হয়েছে?... জানো ম্যাম কি লেকচার দিয়েছেন?'' সে আজ প্রায় কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, ভালো করে কথা বলতে পারে না, কেমন যেন জিভ জড়িয়ে যায়।

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ডোরবেল বাজল। আয়ূষী দরজা খুলে দেখল ডাক্তার বোস এসেছেন। ডাক্তার বোস চলে গেলেন সোজা এলিনার ঘরে এবং প্রচণ্ড রূঢ় মেজাজে বলে উঠলেন, ''আপনি আবার ওর ঘরের দরজা খুলেছেন? অনেকবার আপনাকে বলেছি একটা নার্স রাখুন। আপনাকেও তো বেশ দুর্বল লাগছে! কেন কথা শোনেন না বলুন তো?''

সত্যিই তো, ডাক্তার বোস কতবার নার্সের কথা বলেছেন, কিন্তু আয়ূষী রাখেনি। ও চায়নি ওর মেয়েটাকে অন্য কারোর হাতে তুলে দিতে। এলিনা যখন ছোট ছিল তখনও তো, আয়ূষীই ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে— খাওয়ানো, স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ওর জামাকাপড় কাচা, ওকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, সবই তো আয়ূষীই করেছে। এলিনার বাবা শুভজিৎ অফিসের কাজে বেশিরভাগ সময়টাই বাইরে থাকতেন, তাই আয়ূষীই সব করেছে।

ঠিক সেইরকমই, আয়ূষী ভাবে এলিনা কোনওদিন বড়োই হয়নি, সেই ছোটটি থেকে গেছে। তাকেই ওকে আস্তে আস্তে বড় করে তুলতে হবে। ডাক্তার চেক আপ করে চলে গেল, আয়ূষী এলিনাকে স্নান করালো, মাথাটা মুছিয়ে, আঁচড়ে মাথার পাশে ছোট কাজলের টিপ দিল, আয়ূষী ওকে বলল, ''কিছু খাবি?'' এলিনা না জানালে আয়ূষী দরজা বন্ধ করে চলে যায়। আবার সোফায় বসে ভাবতে লাগল এলিনা, ইউনিভার্সিটির ওই দিনগুলির কথা।— হঠাৎ সেদিন মাকে জড়িয়ে বলল, ''মা জানো, আজ আমাদের ডান্স গ্রুপের সিলেকশন, প্লিস আমাকে উইশ করো যেন আমি সিলেক্ট হই।'' সেই সাত বছর বয়স থেকে নাচ শিখছে, ব্যালে ডান্স। আজ ওর বাইশ বছর বয়স। এত বছরে সে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে, অনেক প্রাইজও পেয়েছে। আয়ূষী বেশ স্নেহভরা ধমকের স্বরে বলে উঠল, ''কেন হবে না বল তো? এত বছর ধরে নাচ শিখছিস, কত প্রাইজও পেয়েছিস। দেখিস বেশ ভালভাবেই তোর সিলেকশান হয়ে যাবে।'' এ কথা বলে আয়ূষী মেয়ের মাথায় চুমু খেল, আয়ূষীও মার গালে একটা চুমু দিয়ে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কালচারাল রুমে সিলেকশান হচ্ছিল, ম্যাম এলিনার নাচ দেখে বললে, ''অসাধারণ''। ওর সিলেকশনও হল। কলেজে এলিনা কালচারাল গ্রুপে পার্টিসিপেট করেনি, ভেবেছিল ৯০% নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সেখানে ড্যান্স গ্রুপে জয়েন করবে। তাই কলেজে শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা-ই করেছে। সেদিনই সিলেকশনের পর, হঠাৎ একটি মেয়ে কুহু, এলিনার কাছে এসে বলল, ''কিরে একটা ছোট কমপিটিশন হয়ে যাক''। আয়ূষী লাফিয়ে উঠল, সে এসব প্রতিযোগিতা পছন্দই করে। পুরো কালচারাল রুম করতালির শব্দে মেতে উঠল। কুহু একটা স্টেপে শেষ করলে, আয়ূসী আর একটা স্টেপ করে, এভাবে প্রায় একঘন্টা কেটে গেল। এরপর এলিনা হার মেনে বসে পড়ে। বলল, ''কুহু তুই জিতেছিস। খুশী তো? আমাকে এটা বল তুই এত কী করে পারিস?'' কুহু উত্তরে বলেছিল, ''পরে বলব। এই ডান্স তো একটা নেশা, এটা ধরে রাখতে আর একটা নেশার দরকার হয়।'' কথা বলে কেমন একটা ব্যঙ্গের সুরে হেসেও চলে গেল।

এলিনা বাড়ি ফিরে মাকে কথাটা বললে, মা বলল, ''কী দরকার

ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

শুরুতেই কমপিটিশন করার! ওসব কথায় কান না দিয়ে মন দিয়ে শিল্পটা কে ভালোবাসো, দেখবে সে-ও তোমাকে ভালবাসবে।" এরপর এল সেই কালচারাল ট্যুরের দিন এলিনা ট্যুরে গেল, ফিরেও এল। কিন্তুও যখন ফিরে আসল, কেমন যেন বদলে গেছে। যে মেয়েটা মাকে এ টু জেড বলত, সে মার থেকে এত দূরে সরে গেল, কী করে! সারাদিন ঘরের দরজা বন্ধ বসে থাকে। একদিন আয়ূষী দরজা নক না করে ঢুকে গেল, দেখল, এলিনা হাতের কবজিতে শিরার মধ্যে কিছু একটা ইনজেক্ট করছে। আয়ূষী চমকে উঠল, চিৎকার করে বলল, ''এলিনা, কী করছিস কী?'' আয়ূষী কোনরকমে সিরিঞ্জটা নামিয়ে রেখে বলল, ''কিছু না মা, ব্লাড টেস্ট-এর জন্য রক্ত নিচ্ছিলাম।

আয়ূষী বলল, ''বোকা পেয়েছিস আমাকে? আমি কিছু বুঝি না নাকি?'' এলিনা খালি সিরিঞ্জ নিয়ে মার হাতে ফুটিয়ে কিছুটা রক্ত নিয়ে ব্লাড টেস্টারে নিয়ে বলল, ''মা আমি এভাবেই ব্লাড টেস্ট করছিলাম। দেখো তোমার ব্লাড গ্রুপ (বি'), মা বি পজিটিভ জাস্ট রিলাক্স মা।" মাএর মন সবসময় ছেলেমেয়েদের দোষ ঢাকতে চায়। আয়ূষী ব্যাপারটা বিশ্বাস করল আর বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আজ আয়ূষী ভাবে, হয়তো সে যদি ওর কথা শুনে বিশ্বাস না করত, যদি ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখত, তাহলে এলিনার এই অবস্থা হত না। তারপর থেকে এলিনা মাঝে মাঝেই বলত, ''মা টাকা দাও, পকেট মানি শেষ হয়ে গেছে। মা টাকা দাও ব্যালে শু কিনতে হবে। জুলজির একটা বই কিনতে হবে।" তারপর শুভজিৎ-এর ম্যানিব্যাগ থেকে টাকা উধাও হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সন্ধে বেলায় একটা ফোন এল, ''আপনার মেয়ের অবস্থা খারাপ, তাড়াতাড়ি বি ই হসপিটালে চলে আসুন।" আয়ূষী আর শুভজিৎ খবর শুনছিল; ছুটে গেল হাসপাতালে। গিয়ে দেখল যে এলিনা ছোটবেলায় দাঁতে ব্যথা হলে ডাক্তারখানায় যেতে চাইত না, সেই এলিনা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। ওর হাতে নাকে স্যালাইন পাইপ লাগান রয়েছে। ডাক্তার বলেছিলেন, ''শি ইজ হাইলি ড্রাগ অ্যাডিকটেড। ইমেডিয়েটলি ট্রিটমেন্ট শুরু না করলে, শি ক্যান লস্ট ফর্ম দিজ ওয়ার্ল্ড ফোরএভার।" তারপর থেকে চারমাস ধরে ওর ট্রিটমেন্ট চলছে, বড়িতে ওকে ওর ঘরের দরজা বন্ধ করে আটকে রাখা হয়, তারপর মা ওর হাত, পা বেঁধে স্নান করিয়ে,খাইয়ে দেয়। নতুবা অ্যাডিকশনের দরুণ চিৎকার, চেঁচামেচি করে মার কাছে টাকা চায়, ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, সেজন্য ওকে বেশিরভাগ সময়টাই স্লিপিং ট্যাবলেট দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়।

এখন আর এলিনা খেতে চায় না, ওর ওই সেদ্ধ ভাত খেতে ভাল লাগে না; একদিন আয়ূষী ওকে ডিমের ঝোল-ভাত খাইয়েছিল। তারপর ডা. বোস খুব বকেছিলেন আয়ূষীকে, ''মিসেস দাস আপনি কি মেয়েকে ফিরে পেতে চান না? ওষুধের পরিমাণ তো খুব কম দেওয়া হয়, বেশি ডোজ দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তার ওপর আপনি ওকে এতটা রিচ খাবার দিলেন! এটাতো পুরো ওষুধের অ্যাকশনটাই নষ্ট করে দেবে।" তারপর থেকে আয়ূষী বাড়ির সবার জন্যই সেদ্ধভাত রান্না করে। মেয়ের জন্য একটু স্যাক্রিফাইস তো মা-বাবা করতেই পারেন।

এমন ভাবতে ভাবতে আয়ূষী কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, খেয়াল নেই, ডোরবেল বাজল। আয়ূষী ঘড়িতে দেখল সাতটা বাজে, উঠে দরজা খুলে দিল। শুভজিৎ বলল, কাল ৯টায় ফ্লাইট ওদের। এলিনাকে দিল্লিতে নিয়ে যেতে হবে। ওর এক অফিস কলিগ আর ডা. বোসের সাথে আলোচনা করে, ওরা এলিনাকে দিল্লির একটা sanctuary-তে নিয়ে যেতে বলেন।

পরদিন সকাল হল, বাবা-মা এলিনার ঘরে গিয়ে বলল, ''মা, আজ ৯টায় ফ্লাইট আমাদের। দিল্লির একটা sanctuary-তে রাখা হবে তোমাকে, মাত্র দু-এক মাস। তারপর সব আগের মত হয়ে যাবে।" আয়ূষী এলিনাকে খাইয়ে, স্নান করিয়ে; নিজে দু-এক গ্রাস মুখে দিল। তারপর ব্যাগপত্র নিয়ে ওরা ট্যাক্সিতে উঠল এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। এলিনা এমনভাবে বাড়িটাকে দেখছে যেন আর কোনদিনও এখানে ফিরবে না।

হলও তাই। ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল মা ট্যাক্সিতে, যাতে রাস্তায় কোনও অসুবিধা না হয়, এবং ঘুমন্ত অবস্থাতেই বাবা ওকে প্লেনে তুলেছিল। প্লেন থেকে নেমে ওরা ওই sanctuary-তে গেলে ডা. বোস ঘুমন্ত অবস্থায় এলিনাকে পরীক্ষা করে বললেন, ''সি ইজ ডেড।" আয়ূষী আর শুভজিৎ-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কার্ডিয়াক প্রবলেম আর শিরায় বারবার ইনজেক্ট করার দরুণ ওর ব্লাড প্রেশার ওঠা নামার দরুন প্লেনে ওঠার দশ মিনিটের মধ্যেই ওর মৃত্যু হয়েছে।

কত স্বপ্ন দেখেছিল আয়ূষী ও শুভজিৎ এলিনাকে নিয়ে, সে সুস্থ হয়ে যাবে, আবার আগের মত হয়ে যাবে। তারপর জুলজিতে ডক্টরেট করে কোনও কলেজে পড়াবে। একটা নাচের স্কুল খুলবে। কিন্তু হায়! সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল, চলে গেল তাদের সেই ছোট 'এলি', সারা জীবনের মত... শুধু রয়ে গেল বাবা, মা-র চোখে 'দু-ফোঁটা জল' আর শূন্য বুকজোড়া 'মেয়ের স্মৃতিগুলো'...

দ্বিতীয় মৃত্যু

সুভাশিষ বেরা

রাত সাড়ে দশটা

লম্বা একটা বাঁশি বাজিয়ে জগন্নাথ এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন ছাড়লো। কত মানুষের কান্না ভেজা বিদায় মুহূর্ত, কত লোকের নতুন দিনের স্বপ্ন, কারুর বা শুধুই রোজগারের তাগিদে ট্রেনের সওয়ারী হওয়া। আমি চলেছি স্যর, ম্যাম ও সহপাঠীদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে। স্যার, ম্যাম ও সহপাঠী সবাই মিলে হৈ-হৈ করে ট্রেনে চড়ে চলছি আমরা পুরীর সমুদ্র দেখতে। হ্যাঁ জগন্নাথ দেবকে তো অতি অবশ্যই দেখব, পূজাও দেব সকলে।

হুহু শব্দে ছুটে চলেছে যন্ত্র অজগরটা। কোলাঘাট ব্রীজ পেরিয়ে পাঁশকুড়া ছুঁয়ে ট্রেন ছুটেছে খড়গপুরের দিকে। হঠাৎই মনে পড়ে যায় মধুশ্রীর কথা। মধুশ্রী পিশেমশাইয়ের একমাত্র মেয়ে— আমার একমাত্র স্নেহের বোন। খুবই ভালোবাসতাম ওকে। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন ওকে বাড়িতে এনেছিলাম। ও বায়না ধরেছিল রেলগাড়ি দেখবে। নিয়ে এসেছিলাম লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে। সেখান থেকে টিকিট কেটে সোজা আমরা চলে গিয়েছিলাম সোনারপুর। ওর কী আনন্দ! চলতি ট্রেনে গাছগুলো দেখে ও বলছিল-- 'দেখ্ দাদা, ওই গাছগুলো কেন পিছনের দিকে ছুটছে বলতো?'

আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম— 'গাছ ছুটছে না, আমরা ছুটছি, ও বিশ্বাস করেনি সেদিন।'

আজ জীবনের রেলগাড়িতে আমি কোথায়, আর মধুশ্রী কোথায়! কে সামনে আর কেইবা পিছনে ছুটছে! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আমার বুকের গভীরতম প্রদেশ থেকে। আহা বেচারা! যদি একবার দেখতে পেতাম ওকে! মা-বাবার বিরুদ্ধে রাকেশকে বিয়ে করে সেই যে ঘর ছাড়লো...। আর কোন খবর নেই মধুশ্রীর। বেঁচে আছে কি না কে জানে?

এই যে সুভাশিষ কফি খাবে নাকি? আমার এক সহপাঠী ডাকতেই ঘোর কাটলো আমার। ট্রেন খড়গপুরে এসে থামলো।

কফি খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ছুটলো জগন্নাথ এক্সপ্রেস। পুরীতে নামলাম বেলা ১১টা নাগাদ, স্যার ও ম্যামদের নির্দেশমত অন্যান্য সহপাঠীদের নিয়ে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। মালপত্র রেখে সমুদ্র স্নান সেরে সবাই জগন্নাথ দেবের মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরতে বিকাল ৩ টা বেজে গেল।

আজ আর কোথাও যাওয়া হবে না— এই চিন্তা করে সবাই বিশ্রাম করছে। সন্ধ্যা 'দু' টা নাগাদ হোটেলের ঘর ঝাঁট দেওয়ার জন্য এক বিধবা মহিলা এল। ওদিক থেকে ঝাঁট দিয়ে যখন আমার বেডের কাছে এল তখন হঠাৎ তাকে দেখে আমার বুকের ভিতরটা যেন দম বন্ধ হয়ে এল। কে? এ কে...! বাইরে বেড়াতে এসে হোটেলের একজন ঝাড়ুদার মহিলার সঙ্গে আন্তরিক বাক্য বিনিময় করাও ঠিক উচিত কাজ হবে না, এদিকে ঐ মহিলা ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করে চলে যাওয়ার উপক্রম।

এই যে শুনুন, হ্যাঁ, তুমি, এস এদিকে...। আড়ষ্টভাবে তাকে ডাকলাম। মুহূর্তে ভূত দেখার মত সেই মহিলা চমকে উঠে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমার সহপাঠিরা এ দৃশ্যে অবাক হয়ে গেল।

— কি ব্যাপার শুভাশিষ, ঐ মহিলা ও রকমভাবে ছুটে পালিয়ে গেল কেন?

— না, কিছু না। আমি সোজা ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে ঢুকি। ম্যানেজারের কাছে ঐ মহিলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে তেমন কিছু জানতে পারলাম না। অগত্যা হোটেলের মালিককে বলে মহিলার সঙ্গে যাতে দেখা করা যায় তার ব্যবস্থা করলাম, মালিকের ঘরেই।

কিন্তু ওই ভদ্রমহিলা আসছে না কেন আমাদের ঘরের মধ্যে? তাহলে কি...? আর ভাবতে পারছি না আমি। নিজেই বেরিয়ে এসে যেই ডাকলাম— তুমি কি মধুশ্রী?

মুহূর্তেই কান্নায় ভেঙে পড়ে মধুশ্রী,— দা—দা...। মধুশ্রী আর নেই দাদা, মধুশ্রী মরে গেছে, কেন আর ঐ নামে তাকে ডাকছো? আমার গলা জড়িয়ে ধরে মধুশ্রীর সে কি কান্না!

সমুদ্রের উথাল-পাথাল ঢেউ-এ আমার অন্তর কখনো ডুবছে কখনো আবার ভাসছে, আর চোখ বেয়ে নামছে আষাঢ়ের গিরি নিশ্রাব।

অনেকক্ষণ কাঁদছিলাম ভাই-বোন।

জিজ্ঞাসা করলাম— কেমন করে হল তোর এ অবস্থা? রাকেশ কোথায়? তুই...! হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি মধুশ্রীর দিকে।

না দাদা রাকেশ বেঁচে নেই। আমরা পাঁচ বছর ঘর করেছিলাম

ছাত্র, এডুকেশন বিভাগ

পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরী গ্রামে। এক কন্ট্রাক্টরের অধীনে ও কাজ পেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ড্রাগের নেশা ধরলো— আস্তে আস্তে জীবনটাকে শেষ করে দিয়ে আমাকে পথের ভিখারী করে দিয়ে চলে গেল।

— তারপর তুই বাড়ি ফিরে গেলি না কেন?

এরপর আর ফেরা যায় না দাদা। আমাদের বাঙালী মেয়েরা একবার ঘর ছাড়লে সমাজ কখনো পূর্বের স্থানে তাকে ফিরিয়ে নেয় না। ভাগ্যকে সম্বল করে ট্রেনে চেপে বসলাম। মহাপ্রভুর এই ধামে কেউ কখনো না খেয়ে মরে না। শেষ পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে এই হোটেলে। বাসন মাজি, ঝাঁট দিই। আমার দিন কেটে যায়। চলেও যাবে এইভাবে যতদিন বাঁচব। এরা আমাকে কখনও খারাপ চোখে দেখে না।

— না, তুই আমার সঙ্গে বাড়ি চল।

— বাড়ি? আচ্ছা দাদা, তুই কি বাড়িতেই আছিস?

— না, আমি কোলকাতায় পড়াশুনার জন্য চলে গেছি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর মধুশ্রী বলে—

আচ্ছা দাদা, মামা ও মামিমা কেমন আছে?

খুবই ভালো আছে কিন্তু তোর মামা যেমনি থাকে তেমনি আছে।

আমার মামা ও মামিমাকে দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছে।

তাহলে বাড়ি চল?

না-না, দাদা, আমি দূর থেকেই দেখে নেব ওদের, তুই ওদের জানাবি না আমার কথা।

— কেন? তারা তাদের মধুশ্রীকে দেখবে না?

— মধুশ্রী! হায় কপাল, মধুশ্রী কি আর বেঁচে আছে? না-না, আমি আমার এ পোড়া-মুখ ওদের দেখাব না, না দাদা, কখনো না— বলেই কেঁদে ওঠে মধুশ্রী।

দাদা, এ পৃথিবীতে আমি আর কারুর আত্মীয় হতে চাই না। অনেক সাধ ছিল একবার তোকে দেখব, সে সাধ আমার পূরণ হয়ে গেছে। আমার কোন আশা নেই, প্রভু জগন্নাথ, এবার তোমার পায়ে টেনে নাও এ অভাগী মধুশ্রীকে। কি বলছিস এসব? আমাদের সঙ্গে তুই ফিরে যাবি। তখন রাত ৯ টা। রাতের খাবার খেয়ে সবাই শুয়ে পড়লো।

সকালে একটা হৈ-চৈ শুনে হোটেলের নীচে গিয়ে দেখি মধুশ্রী তার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ছোটো একটা চিরকুটে লেখা— তোমরা আমাকে জীবন সাগরে জাগিও না। মধুশ্রীর এবারের মৃত্যু বড় সুখের।

কতক্ষণ ওর মৃত দেহের সামনে বসেছিলাম কে জানে? হঠাৎই আমার এক সহপাঠীর ডাকে সম্বিত ফিরলো। সমুদ্র দেখতে এসেছিলাম— দেখলাম সংসার সমুদ্রে আমাদের জীবনগুলো কেমন মোচার খোলার মত ভাসছে আর ডুবছে।

অনিন্দিতা দাস

শ্রী-শ্রী-গণেশায় নমঃ

দীপিকা নস্কর

দেবস্মিতা বসাক

পাহাড় কোলে মাদল বাজে

তনুশ্রী হাঁসদা

'পাহাড় কোলে মাদল বাজে' দক্ষিণ বাঁকুড়ার জায়গা মানেই পাহাড় জঙ্গল ঘেরা। রয়েছে শাল, পিয়াল, মহুয়া, আসন, পলাশ, কেন্দু নানান গাছের সমাহার। মা আসার আগেই পাহাড়-জঙ্গল ছাপিয়ে শোনা যায় মাদলের দ্রিমদ্রিম ধ্বনি, যেন মা দুর্গার পদধ্বনি। মা আসছেন, সর্বত্র মা-কে কেন্দ্র করে সাজো সাজো রব। প্রকৃতিও নিজের মতো করে সেজে ওঠে। পাহাড়ী ঝরণার সরু হয়ে বয়ে যাওয়া স্রোতের দু'ধারে কাশফুল, জঙ্গলে জঙ্গলে শিউলিগাছের ফুলে ফুলে সেজে দাঁড়িয়ে থাকা, জলাশয়গুলোতে শালুক, পদ্ম-র রঙিন সমাহার উৎসবের দিনগুলিকে রঙিন করে তোলে।

শরৎ ঋতুর আগমন এক অন্যরকম আমেজ নিয়ে আসে— যদিও মফস্বলে প্রতিটি ঋতুকেই আলাদাভাবে চেনা যায়। শরতের উজ্জ্বল প্রকৃতির মাঝেই আগমন ঘটে মা দুর্গার। মফস্বলের উৎসবে আড়ম্বর থাকে না কিন্তু প্রাণ থাকে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বেশিরভাগ জায়গাতেই পুজোর জমজমাট পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায় অষ্টমী থেকে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণের জায়গাগুলিতে দুর্গোৎসবে ঢাকের সাথেই মাদলের সহাবস্থান। দশমীতে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। লোকগান, লোকনৃত্য, কাঠিনাচ, দাঁশাই নাচ, প্রভৃতি গ্রামের মানুষের প্রাণের পরশে পরিবেশিত হয়।

দশমীর রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে যায় জাওয়া পরবের প্রস্তুতি। সন্ধ্যা হলেই কুয়াশা ঘেরা পাহাড়তলি থেকে ভেসে আসে মাদলের শব্দ। জাওয়া শস্য বোনার উৎসব। এই উৎসবে প্রধান ভূমিকা পালন করে মেয়েরা। বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়ি এসে এই উৎসবে সামিল হয়। সাতদিন ধরে শস্যর সমৃদ্ধি কামনা করে নানান নিয়ম পালিত হয়। একটি ডালাতে মাটি রেখে তার ওপর শস্যের বীজ বোনা হয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষি প্রধান জীবিকা, তাই প্রতিটি গ্রামেই জাওয়া পরব পালিত হয়, শোনা যায় গানের সুর। সাতদিন পর নানান নিয়ম নীতি ও নাচগানের মাধ্যমে শস্যের ডালাকে পুকুরে বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

জাওয়া পরবের পরেই কালীপূজোর প্রস্তুতির সাথেই শুরু হয় বাঁধনা অর্থাৎ শহরায় পরবের প্রস্তুতি। বাঁধনা-র আগে পাহাড় জঙ্গলের মাঝখানে থাকা ছোট ছোট গ্রামগুলি সেজে ওঠে। শহরায় উৎসবে বিবাহিত মেয়েরা বাবার বাড়ি আসে,— 'এত বড় বাঁধনা পরবে/ রাখবি মাগো শ্বশুর ঘরে' গানের মধ্যে দিয়ে নারীর চিরাচরিত কষ্ট ফুটে ওঠে।

জাওয়া যেমন শস্য সমৃদ্ধির উৎসব, বাঁধনা পরব কিছুটা সেরকমই। এখানে গো-মাতার আরাধনা করা হয়। বাঁধনার আগের দিন রাত্রিতে হয় জাগরণ, অর্থাৎ গরুকে জাগানো হয়। আর পরের দিন সকাল থেকেই পাড়াতে সাজো সাজো রব। শুরু হয় নানান আচার অনুষ্ঠান। আতপ চালের গুঁড়ির আল্পনা দিয়ে তার ওপর ধান ফেলে রাখা হয়। আল্পনা দেখলেই বোঝা যায় কোনটা কোন গোত্রের আল্পনা, কোন বাড়ির আল্পনা। বাঁধনা গ্রামাঞ্চলের বড় উৎসব, আর সেই কারণেই বোধহয় বাঁধনা পরবকে গ্রামের মানুষ হাতির সাথে তুলনা করেন যা গানের মাধ্যমে ফুটে ওঠে—

এত বড় বড় বাঁধনা পরব,
আইসজে যেমন হাতির মতন।
কইরব যতন,
সাইধ্য মতন।

এই সময় গ্রামে গ্রামে উৎসবের উষ্ণতা, শীতল হাওয়াকেও হার মানিয়ে দেয়। পাহাড়ে জঙ্গলে ধ্বণিত হয় গানের সুর, মাদলের শব্দ। বাঁধনার দিন বিকেলে সমবেত ভাবে নাচ গান শুরু হয়। পুরুষ এবং মহিলা সমবেতভাবে নাচগান করে, পুরুষেরা মাদল, ধামসা, ন্যাগরা, শিঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজায়। বেশির ভাগ গান প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গাওয়া হয় যেমন—

১) শুকনা ডালে ফুল ফুটেছে/ নদীর জলে মাছ খেলছে/ ফুল সমান মনরে/ মাছ সমান জিয়ন রে।

২) বীর বুরু তাল্লারে/ জানাম তাবন বয়হারে/ বীর বুরু দ দেবন বয়হা/ বানচাও দহ য়া। (অনুবাদ— পাহাড় জঙ্গলের মাঝে আমাদের জন্ম, সবায় মিলে সেই পাহাড় পর্বতকে রক্ষা করব)

৩) লাহালেকা (আগের মতো) গাছপালা এখন বানুঃ আ (আর নেই)।

লাহালেকা দাঃরিমিল (মেঘবৃষ্টি) এখন বানুঃ আ।
লাহালেকা বয়হা সুলুক (মানবিকতা) এখন বানুঃ আ।
অনাতেগে (সেইজন্য) আগের মতন শহরায় জমক বানুঃ আ (মজা নেই)।

এইভাবে নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে সারারাত শহরায় অর্থাৎ বাঁধনা উৎসব পালন করা হয়।

বাঁকুড়ার দক্ষিণে অবস্থিত গ্রামগুলিতে প্রবল উৎসাহ সহকারে শহরায় (বাঁধনা) পালিত হয়। এই পরবে কৃষির সমৃদ্ধি কামনা করা হয়, এই বাঁধনাতে দু-দিন কৃষিকাজ বন্ধ থাকে। শহরায় হওয়ার পর ফসল কাটা শুরু হয়। শহরায় গ্রামাঞ্চলের অন্যতম উৎসব। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পাহাড় কোলের গ্রামগুলো থেকে গানের সুর ও মাদলের বোল ভেসে আসে।

বাংলা বিভাগ

সাতশো কোটির স্বপ্ন

অসিদ্বীপ প্রামানিক

মানুষই স্বপ্ন দেখে, আর সেই স্বপ্ন মানুষই সত্যি করে। অন্য কোনও জীবের পক্ষে তা সম্ভব নয়— একথা সকলের জানা। এই পৃথিবীতে সাতশো কোটি মানুষের স্বপ্নও সাতশো কোটি। আর এই স্বপ্নগুলি হয় কত রকমের। কিন্তু একটা স্বপ্ন যেন সকলের আছে, তা নিতান্তই সাধারণ-খেয়ে, পরে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার। যতদিন যাচ্ছে স্বপ্নের কারবারিদের বাড়বাড়ন্তে এখনই ওই স্বপ্নটুকুই কেনাবেচা শুরু হয়ে গিয়েছে। স্বপ্ন কেনা বা বেচার ক্ষমতা তো সকলের নেই। পৃথিবীর সব স্বপ্নই এখন দুটো মেরুতে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এই মেরু পৃথিবীর উত্তর কিংবা দক্ষিণ মেরু নয়, এই স্বপ্নের দুই মেরুতে একদল রয়েছে কোনও রকমের বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখার মানুষ, অন্য দল হল পৃথিবীর দখলদারির স্বপ্নে মাতোয়ারা। অথচ সব কিছুই ঘটছে এই একটাই পৃথিবীকে ঘিরে। আর এর রসদ জুগিয়ে চলেছে প্রকৃতি। সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে প্রকৃতির রহস্যকে বুঝতে ও জানতে গিয়ে যেমন নতুন নতুন বিজ্ঞান ভাবনার জন্ম হয়েছে, তেমনই নিজের দরকারটুকু মেটাবার তাগিদে সেই বিজ্ঞান ভাবণাকে কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন কারিকুরি খুঁজে পেয়েছে। কারিকুরি গুলোকেই সাজিয়ে গুছিয়ে বলা হয় প্রযুক্তি। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে যোগাযোগকে গভীরতর করেছে প্রযুক্তি। অনেকে বলেন, প্রযুক্তি হল মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যকার ভাষা, সাধারণভাবে সব ভাষা তো সবাই বোঝে না, বোঝা সম্ভবও নয়। পৃথিবীতে মানুষের মুখের কতরকম ভাষাই তো আছে, তাতে এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের কথাবার্তায় তো কোনও অসুবিধে হয় না। কারণ একটাই, তা হল পারস্পরিক বোঝাবুঝি। কথাবার্তায় এ বোঝাবুঝি থাকলেও প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যেকার ভাষা বা প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোনও বোঝাবুঝি গড়ে ওঠেনি। যারা ওই ভাষাকে ভালোমতো রপ্ত করেছে, তারা কখনো ভাগ করে নেয়নি বা নেয় না। তার পরিণতিতে প্রকৃতির ভাঁড়ারের দখলদারি এক দলের হাতের মুঠোয়, তারাই গোটা পৃথিবীকে বেচাকেনার স্বপ্ন দেখে। অন্য দল হাড়, মাংস এক করে খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই খোঁজে। তাদের স্বপ্ন একচিলতে ছাউনির। এসব শুনে মনে হতে পারে যে কোনও অনুমান বা কল্পনার নিরিখে এই নিবন্ধ লেখা। একেবারেই নয়। এখন তো সংবাদমাধ্যমের দৌলতে কোনও কিছুই অচেনা বা অজানা নেই। এক পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায় পৃথিবীতে প্রতিদিন ২২ হাজার শিশু মারা যায় খেতে না পেয়ে। আমাদের মতো পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো মিলিয়ে প্রায় একশো দশ কোটি মানুষ দরকার মতো জল পায় না। এই দেশগুলোতে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন শিশুর ঠিকঠাক মাথা গোঁজার জায়গা নেই। এসব হিসেবপত্তর রাষ্ট্রসংঘ কিংবা কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার করা। ফলে গরমিলের কোনও সুযোগ বিশেষ নেই। একুশ শতকের কী এই হিসেবে লজ্জা পায় না।

খাবার দাবার, খাওয়ার জল কিংবা থাকার জায়গা ওই সব কিছুর যোগানদার তো প্রকৃতি। পৃথিবীতে পুকুর, নদী, ঝরণা, জমি, গাছপালা— এই সবইতো রয়েছে। এদেরকে ব্যবহার করেই তো মানুষ বেঁচে থাকে। তাহলে ওই শিশুগুলোর কাছে প্রকৃতির এই উপাদানগুলো কেন অধরা? এর কারণ বুঝতে হলে অন্য আরেক হিসেবের কথা জানতে হবে। পৃথিবীর যতো মানুষ রয়েছে, তাদের সকলেই ব্যবহারযোগ্য পানীয় জলের অধিকারী নয়। জল না পেলে মানুষ বাঁচতে পারে না। এখন প্রকৃতির জলেরও বেচাকেনা হয়। স্বাভাবিকভাবে তার অধিকার গরিব নিঃস্ব মানুষদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

বেশিদূর যেতে হবে না। আমাদের দেশেরই ছত্তিশগড়ের শিবনাথ নদীর প্রায় ২৪ কিলোমিটার চুক্তির ভিত্তিতে মালিকানা দেওয়া হয়েছে এক বেসরকারি সংস্থাকে। ২০০৫ সালে মহারাষ্ট্র সরকার জলকে কেনা বা বেচার এবং জল নিয়ে ব্যবসার স্বীকৃতি দেয়। পৃথিবীর নানা দেশে এই ঘটনা ঘটেছে। কিছু অর্থলোভী মানুষের দখলদারিতে রয়েছে নদী, নালাগুলো। উন্নয়শীল দেশে জল কিনে খাওয়া এখন বাধ্যবাধকতার মধ্যে চলে এসেছে। যাদের কেনার ক্ষমতা নেই। তাদের জল খাওয়ার সুযোগটুকু ক্রমশঃ কমছে। এরকম এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে আমরা এগোচ্ছি। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ নেওয়া দেশগুলো করতে বাধ্য হয়েছে কারণ এ হল ঋণশোধের শর্ত। শুধু জল নয়, জমিজমা, জঙ্গলও ধীরে ধীরে অল্প কিছু স্বার্থপর মানুষের সম্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

এক সময় পাহাড়ি এলাকায় পাহাড়ের জমিতে ওখানকার মানুষরা থাকতেন। অদ্ভুতভাবে পাহাড়ি জমি, পাহাড়ের গায়ের অংশগুলোও বিক্রি হয়ে গেছে। মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। ওখানকার উপজাতিরা মিলেমিশে থাকত। সেই জমির অধিকার সকলের। ওরাই নিজেরা ঠিক করত যে কোথায় বাড়ি ঘর করবে। কোথায় চাষ করবে। কিন্তু কিছু পয়সাকড়িওয়ালা লোকজন তা কিনে নিল। বাস্তুহারা হয়েছিল উপজাতি মানুষগুলো। মাথার ওপরের ছাউনিটুকু হারিয়েছিল।

এভাবে মানুষের সবকিছু থেকে সহজাত অধিকারটুকু হারিয়ে যাচ্ছে আর তা কুক্ষিগত হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। শুধু পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদান নয়, মাটির নিচের তেল, কয়লা, খনিজ সম্পদের হাল একই। ২০০৯ সালে ওড়িশার সরকার দক্ষিণ কোরিয়ার পসকো সংস্থাকে সুন্দরগড় জেলার লৌহ আকরিকের খনির প্রায় ২৫০০ হেক্টর চুক্তিভিত্তিক মালিকানা দিয়েছিল। এ নিয়ে ওড়িশার মানুষের লড়াইয়ের কথা সকলেরই জানা।

আঠারো শতকের ছয়ের দশকের শিল্পবিপ্লব সভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, নতুন রকমের উপায়কে ব্যবহার করে উৎপাদনের ধরণধারণকে পাল্টে দিয়েছিল। তাতে সবদিকে যেমন সভ্যতা অনেক বেশি গতিতে এগিয়েছিল, অন্যদিকে প্রকৃতির উপাদানগুলোকে যথেচ্ছভাবে কাজে লাগাবার এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, বিশেষ করে মাটির নিচের কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ সম্পদকে। পরিণতিতে প্রকৃতির ভাঁড়ার শুধু কমে আসেনি, পরিবেশের উপাদানগুলোর ও স্বাভাবিক মাত্রারও হেরফের ঘটেছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মত ক্ষতিকর উপাদান অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। পৃথিবীতে এখন যা প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত আছে, এভাবে চললে তা দিয়ে আর মাত্র ৪৬ থেকে ৫৫ বছর চলবে। আর কয়লা? হিসেব মতো ১১২ বছরের জন্য মজুত রয়েছে। এখনকার হিসেবে খরচ হলে। এতে কিছু দেশ ক্রমাগত ধণী হয়েছে, বেশিরভাগ দেশ গরিব থেকে আরও গরিব হয়েছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে যতদিন গেছে গরিব মানুষের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, ধণীর সংখ্যা কমেছে। অর্থাৎ সবকিছুর অধিকার, মালিকানা অল্প মানুষের কাছে বেশি বেশি করে হাতের মুঠোয় এসেছে, প্রকৃতি অবিরামভাবে নিঃস্ব হয়েছে।

এই পৃথিবীতে সাতশো কোটি মানুষ থাকে। তাদের স্বপ্নের কথা ভেবেই রাষ্ট্রসংঘ মনে করেছে যে প্রকৃতির সম্পদকে সকলে মিলেমিশে ভোগ করার কথা। এটাই হল ২০১৫ সালের পরিবেশ দিবসের রাষ্ট্রসংঘের ভাবনা। প্রতি বছর এরকম নানান বার্তা নিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। কিন্তু এই অচলায়তনে বিন্দুমাত্র কী তার আঁচ লাগে! আজ না লাগুক, একদিন লাগবেই। সেই আঁচেই ছারখার হবে অচলায়তন। কোনও রকমে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর এটাই স্বপ্ন। তা ঘটবে বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়মেই এবং অসহায় গরিব মানুষদের হাত ধরে।

মৃত্যু শতবর্ষে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রেশমী মিত্র

মৃত্যু শতবর্ষের দোরগোড়ায় উপেন্দ্রকিশোর, আর জন্মের দেড়শ' বছর সবে পেরোল। উপেন্দ্রকিশোর আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক? আদৌ প্রাসঙ্গিক কি? 'শিশু সাহিত্যিক' তকমার মধ্যেই কি তাঁকে বেঁধে ফেলা উচিৎ? নাকি তিনি সমান ভাবে বড়দেরও। আমাদের ছেলেবেলা সমৃদ্ধ করেছিল উপেন্দ্রকিশোর— সুকুমার রায়। একদম ছেলেবেলায় উপেন্দ্রকিশোর মানেই বুঝতাম 'টুনটুনির গল্প' আর তার বড়ই জনপ্রিয় লাইন ক'টি— 'রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে।' কিংবা 'বড় মজা বড় মজা, রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা' অথবা 'নাক কাটা রাজা রে, দেখতো কেমন সাজা রে।' বুঝতাম, 'উকুন বুড়ির গল্প', 'পান্তা বুড়ির কথা', 'বোকা বাঘ', 'শিয়াল পণ্ডিত', 'বোকা কুমিরের কথা' ইত্যাদি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'গল্পমালা', 'মহাভারতের কথা', 'পুরাণের গল্প', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'কবিতা ও গান', 'সেকালের কথা', 'বিবিধ প্রবন্ধ' এর প্রত্যেকটি রচনাই মনকে সমৃদ্ধ করে চলেছিল।

না আজকের দিনের মতো টেলিভিশনে 'ছোটা ভীম' কিংবা 'হ্যারি পটার' অথবা 'ডোর্যামন' দের আমরা পাইনি বটে; এরা শিশু মনকে কতটা সমৃদ্ধ বা উন্নত করে— তাও আমার জানা নেই। তবে নিশ্চয়ই কিছু তো একটা আছে, না হলে তারা এত প্রিয় হবেই বা কেন, শিশু বা বড় বাচ্চাদের কাছে। তবে আমাদের শৈশব— বাল্যের বড় আনন্দময় উপকরণ ছিল 'ঠাকুমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' আর সর্বোপরি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। নামেই তাঁর লেখা ছোটদের জন্য। তবে সবগুলির পটভূমিকাই বড়দের ভাবায় অর্থাৎ তাঁর সমসাময়িক ধর্মীয় আর সামাজিকতাকে কেন্দ্র করে সুনিপুণভাবে গল্পগুলো হয়ে উঠেছে। এখানে নেই বিদ্যাসাগরীয় নীতি কথা, নেই শাষণের কড়াকড়ি, শিক্ষকমশাইয়ের চোখ রাঙানী— ''একদিকে ক্লাসিকের সাহায্যে মনুষ্যত্ব শিক্ষা, অন্যদিকে লোক কাহিনীর সাহায্যে অস্তিত্বরক্ষার কলাকৌশল শিক্ষা। আর দুটি শিক্ষাই এসেছে আনন্দময় গল্পবিবরণের সূত্রে, শিল্ডকে কখনোই 'এটা করবে না সেটা করবে না' বলে স্পষ্ট উপদেশ দেননি উপেন্দ্রকিশোর। এখানে পৌঁছে বুঝতে পারি বিদ্যাসাগরের সময়কার কঠোর ও প্রকাশ্য নীতি শিক্ষার লক্ষ্য আর জনপ্রিয় নেই— 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়' ইত্যাদি স্বরক্ষেপের আর তত প্রয়োজনবোধ করছেন না উপেন্দ্রকিশোর।" (ড. পবিত্র সরকার: ভূমিকা উপেন্দ্র কিশোর রচনাসমগ্র)

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বল্লেই অনিবার্যভাবে আসবেই 'সন্দেশ' এর কথা। ১৯১৩-য় নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি। ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি থেকে প্রথম দিকে 'সন্দেশ' প্রকাশিত হ'ত। মুদ্রক আর প্রকাশকের দায়িত্বে ছিলেন শ্রী ললিত মোহন গুপ্ত। ৬৪/১নং সুকিয়া স্ট্রীট স্থিত লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে হৈ হৈ করে মুদ্রিত হতো 'সন্দেশ'। কেবলমাত্র বাংলাতেই নয় আন্তর্জাতিক নিরিখেও হৈ পত্রিকাটির মান হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্-কাল থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সংস্কার আন্দোলন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনের যে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল 'সন্দেশ' ছিল তারই মিলন-মন্দির, কেন্দ্রবিন্দু।

সন্দেশের আবাহণ হয়েছিল কত প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের আদরে আদরে। প্রথম বর্ষের, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২০, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী লিখলেন— ''সন্দেশ এসেছে ঘরে থালা নিয়ে আয়,

খোকা খুকী দাদা দিদি আয়রে ত্বরায়।
এ ''সন্দেশ'' টপ্ করে মুখে পুরে দিলে,
খাইলে পাবিনে রস একেবারে গিলে।''

ঐ ১৩২০, বৈশাখ, প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, লিখলেন—

''নূতন বরষে ভাই আমাদের ঘরে,
'সন্দেশ' এসেছে আজ নব সাজ প'রে।
ডাকিয়া লইব তারে আদরে সবাই,
হাসি মুখে ত্বরা করে আয় তোরা ভাই''

'সন্দেশ' এমন অভিনব, নামকরণই বুঝিয়ে দেয় উপেন্দ্রকিশোর রক্তে বাহিত বুদ্ধিদীপ্ত অথচ শিশু-কিশোর মনের মাঝে তাঁর

বাংলা বিভাগ

রসবোধের পরিচয়। তিনি 'সন্দেশের কথা'য় লিখলেন— 'আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকটে উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে,— অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিন্তু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।' বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আমার ছেলেবেলা'য় লিখলেন, ''ছোটদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে-মাসে আসতো 'সন্দেশ' আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে, আনতো দুই মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেষন।''

যোগীন্দ্রনাথ বসু, প্রসন্নময়ী দেবী, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজন বালা দাসী, প্রিয়ংবদা দেবী, শ্রী কালিদাস রায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ছিলেন না সন্দেশের লেখক হিসেবে? ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, বিদেশের খবরাখবর নিয়ে তৈরী কল্প-বিজ্ঞানের গল্প— সন্দেশে থাকতো অভিনব সব বিষয়-বৈচিত্র্যের সম্ভার। 'প্রাচীন কালের কথা' বলতে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন মহাদেশের চমৎকার, মনোপযোগ ব্যাখ্যা— অথচ কি সহজ তার ভাষা!— ''আফ্রিকা আর আমেরিকার মাঝখানে আটলান্টিক-মহাসাগর। প্রাচীনকালে অনেক দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে এই আটলান্টিক মহাসগারের জায়গায় আরো ঢের প্রাচীনকালে, অর্থাৎ প্রায় এগার বারো হাজার বৎসর পূর্ব্বে 'আটলান্টিস' বলিয়া একটা প্রকাণ্ড দেশ ছিল উহাই নাকি ছিল পৃথিবীর সকলের চেয়ে পুরাতন সভ্যদেশ।'' লেখার সঙ্গে যেন উপরি পাওনা বা ফাউ হিসেবে থাকতো প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের ছবি, প্রাচীন জীব-জন্তুর স্কেচ্। আবার ঐ ভূগোল বিষয়ক রচনা 'ঘুর্ণী বায়ু' কে অল্প বয়সীদের মন আকর্ষণ করার জন্য ঘুর্ণীবায়ুর উৎপত্তি বিস্তারের ছবি। —'সূয্যিমামার ঘর' নামে এক অতুলনীয় নিবন্ধ যা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্দেশের পাতায় লিখলেন— গল্পের ছলে। ছোটদের মনে নীরস পাঠ্যবইয়ের ভাষা উঠলো হৃদয়গ্রাহী।

সেই যে আমরা 'রাজা আর নাপিতের' গল্প পড়েছিলাম— রাজার মাথায় দুটো শিং— সেই নাপিত 'ভবম হাজম'— তাও সন্দেশের পাতাতেই দেখতে পাই প্রথম— লেখক কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়। কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিয়ে সুন্দর তথ্য সম্বলিত লেখা— 'কবি দ্বিজু রায়ের বিষয়ে দু'চারিটা কথা' লেখিকা প্রসন্নময়ী দেবী। পাতায় পাতায় গল্পের সঙ্গে অনবদ্য সব ছবি তো থাকতোই— যা আট থেকে আশি সবার মনের খিদে মেটাতে বাধ্য। কোন সংখ্যাতে থাকতো ছক্ বাজি, ধাঁধা। রাক্ষস-খোক্কসের গল্প এমনকি তার স্বরলিপিটা পর্যন্ত ছাপানো থাকতো সন্দেশের পাতায়।

প্রকাশক-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর সন্দেশের প্রকাশণার মান উন্নত করতে লাভের কথা ভাবেননি। কী গভীর ভালোবাসা দিয়ে, যত্ন দিয়ে সন্দেশকে তিনি জনমানসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। ৫২ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন। মাত্র আড়াই বছরের একটু বেশি সময় তিনি 'সন্দেশ' সম্পাদনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সন্দেশের ৩২ টি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তিনি নিজের সম্পাদনায়। জীবনের শেষ বেলাতেও, অসুস্থ, ভগ্নপ্রায় শরীর— তবু শুধু লিখে গেছেন, এঁকে গেছেন সন্দেশের জন্য।

উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার- সত্যজিৎ— বহুমুখী প্রতিভার এই তিনপুরুষের প্রথম পুরুষ উপেন্দ্রকিশোর বলা বাহুল্য। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার নিরিখে, আর বাঙালীর প্রথম নায়ক রূপে যদি 'গুপী'কে আমরা মনের মণিকোঠায় ঠাঁই দিয়ে থাকি তবে তার বিশ্বকর্মা কিন্তু সেই উপেন্দ্রকিশোর। শুধু কি তাই? সেই বোকা জোলা, ঘ্যাঁঘাসুর; তার বউ ঘ্যেঁঘি— কে ভুলতে পারে? কোন বয়স্ক ভুলতে পারেন তাঁদের শৈশব সমৃদ্ধ এই সমস্ত ক্ল্যাসিকগুলোকে? আজ মুদ্রণ মন্ত্র শিল্পের সীমাহীন উন্নতি। কম্পিউটারের দৌলতে চূড়ান্ত তার প্রযুক্তি। কিন্তু একশ বছরের ও বেশি সময়ের আগে উপেন্দ্রকিশোরের নিজস্ব মুদ্রণ সংস্থা U Ray & Son's— সেই পথিকৃৎ সম মহীরুহকে কে ভুলতে পারে? সাহিত্যিক, চিত্রকর অলংকরণ শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, মুদ্রণ শিল্প-বিশারদ আক্ষরিক অর্থে 'All Rounder' উপেন্দ্রকিশোর জন্মেছিলেন ১২ই মে ১৮৬৩, চলে গেলেন ২০ ডিসেম্বর ১৯১৫। যেন এলেন— দেখলেন— জয় করলেন এই কিংবদন্তী। প্রয়াণ শতবর্ষে অন্তরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

বেঁচে থাকতে ক্রাভমাগা

জয়দীপ ভট্টাচার্য্য

'ক্রাভমাগা! সেটা আবার কি?' সত্যি, নামটা অদ্ভুত। যে কেউ প্রথম শুনতেই অবাক হবে। বড্ড পিকিউলিয়ার নামটা, অর্ধেক সময় লাগে নামটা বুঝতে, আর অর্ধেক সময় লাগে উচ্চারণ করতে। তবে ব্যাপারটা আসলে অতটাও চাপের না, যতটা নাম শুনে মনে হচ্ছে। 'ক্রাভমাগা' হলো একটা মার্শাল আর্ট। 'ক্রাভ মাগা'র জন্ম ইজরায়েলে...। খুব বেশি দিন হয় নি 'ক্রাভ মাগা' তৈরি হয়েছে। সারা পৃথিবীর অন্যান্য মার্শাল আর্টগুলোর থেকে ক্রাভ মাগা বয়েসে অনেক ছোটো। কিন্তু বয়েসে ছোটো হলে কী হবে, ঐ যে একটা গান ছিলো না? ''ছোটা বাচ্চা সমঝ কে হাম সে না টকরানা রে'', ক্রাভমাগার ব্যাপার-টাও ওরকমই। ইমি লিচেনফিল্ট নামে একজন প্রাক্তন ইজরায়েলি সেনা নায়ক বহু মার্শাল আর্ট শিখে সেগুলো নিয়ে গবেষণা করেন। বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে ক্রাভ মাগার জন্ম দেন।

ক্রাভমাগা আসলে আর দশটা মার্শাল আর্টের থেকে আলাদা। ক্রাভমাগা একটু বাস্তব মুখি। আর হবে নাই বা কেন? অন্যান্য প্রচলিত মার্শাল আর্টগুলো আজ থেকে দেড়-দু হাজার বছর আগে তৈরি হয়েছিল। তখন মানুষের মানসিকতা, সমাজ ব্যবস্থা ছিল একেবারে আলাদা। তখনকার টেকনলোজি-ও এত উন্নত ছিল না, তাই মানুষের অস্ত্রও ছিল আলাদা। আক্রমণ করার পদ্ধতিও ছিল আলাদা। এমনকি তখনকার সমাজে এখনকার মতো 'দাদা-ভাই' সম্প্রদায়ও ছিল না। সেজন্য তখনকার মার্শাল আর্ট গুলো সময়সাময়িক প্রয়োজন বুঝেই পাল্টেছে, তাদের মানসিকতা পাল্টেছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বিপদের রূপ ও পাল্টেছে। অথচ সেই সমস্ত মার্শাল আর্টগুলোর মধ্যে এমন কোনো বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়নি, যা দিয়ে এই নতুন গজিয়ে ওঠা বিপদগুলোর মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমাদের তো বাঁচতে হবে। সেই জন্য ইমি আদ্যি কালের ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এলেন। তার মানে এই নয় যে তিনি সেই প্রচলিত মার্শাল আর্টগুলো ত্যাগ করলেন। তিনি সেই মার্শাল আর্টগুলোকে শিকড় বানিয়ে ক্রাভমাগার সৃষ্টি করলেন। দেখা গেলো ক্রাভমাগা আর বাকি মার্শাল আর্টগুলোর থেকে অনেক বেশি সোজা আর বহু গুন বেশি কার্যকরি। কিন্তু একটা সমস্যা থেকে গেলো। ইমি তো সেনা দলে ছিলেন। বহু রেজিমেন্ট, এমন কি বাইরের দেশগুলো থেকেও যখন সৈন্যরা আসতেন ক্রাভমাগার প্রশিক্ষণ নিতে। সেই জন্য ক্রাভমাগা সারাপৃথিবীতে ছড়ালেও শুধুমাত্র সৈন্যদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এটা তো ঠিক না। কেন বাপু, সাধারণ মানুষ কী দোষ করলো? যে ক্রাভমাগার ছত্রছায়া ভাগ পাবে না। তাই পরে সাধারণ মানুষের সামনে ক্রাভমাগা কে তুলে ধরা হলো। কিন্তু সৈন্যদের যে ক্ষমতা আছে, তা তো একটা সাধারণ মানুষের থাকে না, তা সে শারীরিক ক্ষমতাই হোক বা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতাই হোক। সেই জন্য কিছু কিছু জিনিস বাদ দিয়ে তাদের 'সিভিলিয়ন ক্রাভ মাগা' শেখানো শুরু হলো।

সিভিলিয়ন ক্রাভমাগা-তে শেখানো হলো কিভাবে বাস্তব পরিস্থিতিতে পড়লে তার সাথে মোকাবিলা করতে হয় এবং বেঁচে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। এর পদ্ধতিগুলো খুবই সোজা। আমাদের ন্যাচারাল রিফ্লেক্স-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। খুব সহজেই ক্রাভমাগা ব্যবহার করে শত্রুকে ধরাশায়ি করা যায়। যদি কখনও ছিনতাইকারি বা গুণ্ডার পাল্লায় পড়েন, এমন কি কখনও প্রাণ সংশয়ও ঘটে তখন কী কী করণীয় সেগুলোই শেখানো হয় ক্রাভমাগা-তে। তবে ক্রাভমাগার সবচেয়ে ভালো দিক হলো যে, ক্রাভমাগা শিখতে খুব বেশি সময় লাগে না। খুব তাড়াতাড়িই এটা রপ্ত করা যায়, আর ভালো ভাবে ব্যবহার করা যায়।

বর্তমান বিশেষজ্ঞরা বলেন, যদি কেউ নিয়মিত ক্রাভমাগা করে, তাহলে তার ৮০০ ক্যালোরি পর্যন্ত বার্ন হবে। প্রতিটা মানুষই চায় সুস্থ থাকতে সতেজ থাকতে। যদি প্রতিদিন নিয়মিত ক্রাভ মাগা করা হয় তাহলে জিমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, সে মানুষটা এমনিই সুস্থ থাকবে। আর আমরা সবাই-ই জানি যে, সুস্থ শরীরে সুস্থ মনের বাস।

সুস্থ শরীরে যেমন সুস্থ মনের বাস, তেমনি-ই মন ভালো থাকলে শরীরও ভালো থাকে। আর ক্রাভমাগা করলে এই কাজটা খুব ভালো হয়। সাধারণত ক্রাভমাগা করলে মানুষের মধ্যে হার না

ছাত্র, এডুকেশন বিভাগ

মানা মনোভাব, সাহস, আত্মবিশ্বাস খুব ভালো ভাবে তৈরী হয়। আর যার মধ্যে এই তিনটে মানোভাব রয়েছে সে দুশ্চিন্তায় ভোগে না। এখনকার চিকিৎসাবিদরা দুশ্চিন্তাকে মানুষের রোগগ্রস্ত হওয়ার একটা প্রধান কারণ হিসেবে ধরেন। তাই যার দুশ্চিন্তা নেই তার রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কাও কম।

ক্রাভমাগাতে সাধারণ যে ধরনের এক্সারসাইজ থাকে সেগুলোর মাধ্যমে আমাদের স্ট্রেংথ, স্ট্যামিনা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। আমাদের পেশির ক্ষমতা, হার্টের ক্ষমতা বেড়ে যায়। হার্টের অসুখ প্রতিরোধ করতে ভীষণভাবে সাহায্য করে ক্রাভমাগা।

আজকাল সমাজের যা অবস্থা, তাতে প্রতিদিনের খবরের কাগজ খুললেই স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাই। আমরা সাধারণ মানুষ। হয়তো আমাদের সমাজকে পাল্টানোর ক্ষমতা নেই। কিন্তু নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তো রাখতেই পারি। বহু বছর আগে চার্লস ডারউইন বলে গিয়েছিলেন "Only the strongest will survive"। আজকাল মেয়েদেরকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তা আমরা খবরে প্রায়ই দেখতে পাই। তা সেটা ছিনতাইও হতে পারে, অপহরণও হতে পারে বা আরোও অন্য কোনো বিপদও হতে পারে। ধরা যাক কোনো এক মহিলা রাত্রি বেলা অফিস থেকে একা বাড়ি ফিরছেন বা কোনো অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরছেন। দেখা গেলো তখন একদল দুষ্কৃতি বা ছিনতাইকারির কবলে পড়লেন আর তাদের কাছে অস্ত্রও রয়েছে। অথবা ধরা যাক বাসে বা ট্রেনে একা রয়েছেন। তখন তিনি সমস্যায় পড়লেন। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে পড়লে কিভাবে বাঁচতে হয়, তা জানা থাকলে এগুলো তার কাছে কোনো বড় সমস্যা হবে না। কারণ এসমস্ত ধরণের পরিস্থিতি থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে হয় তা ক্রাভমাগা শিখিয়ে দেয়। সমস্যামূলক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে ক্রাভমাগা।

অনেক দিন পর নিজের কাজ থেকে আপনি একটু ফুরসত পেয়েছেন। একাই অথবা পরিবারের সাথে সাউথ সিটিতে শপিংয়ে গেছেন, শপিং করে ফেরার সময় পার্কিং লট থেকে গাড়ি বার করতে গিয়েই হলো বিপত্তি। আপনার পিঠে একটা অস্ত্র ঠেকিয়ে কেউ আপনার গাড়ি চাইছে। বা রাতের ট্রেনে একা একা, ফোনে ফেসবুক করতে করতে বাড়ি ফিরছেন তখন পড়লেন ছিনতাইকারির কবলে তখন কিভাবে আপনি নিজের গাড়ির চাবি বা ফোনটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে বাঁচাবেন। বা দেখা গেলো মাঝ রাস্তায় আপনার গাড়িতে একজন অসহায় অবস্থায় পড়ে লিফট্ চাইছে... আর আপনিও 'দিল দরিয়া' মানুষ। দেখে আপনারও কষ্ট হলো, লিফট্ দিলেন। আর ব্যাস্! গাড়িতে উঠেই নিজের বাবার সম্পত্তি মনে করে আপনার মাথায় বন্দুক ধরে অন্য রাস্তায় যেতে বললো। এবার আপনি কী করে বাঁচবেন। আপনার আবার চিন্তা কিসের। আপনাকে তো ক্রাভমাগাতে শেখানো হয়েছে নিজেকে এরকম পরিস্থিতি থেকে কিভাবে বাঁচাবেন। আপনি ঠিকই বেরিয়ে আসতে পারবেন সেখান থেকে।

একটা কথা আমাদের সবারই সব সময় মনে রাখা উচিৎ যে— "Self defence is not an option, it's our duty" কারণ আপনি নিজে বাঁচলে তবেই পাশের জনকে বাঁচাতে পারবেন।

পার্বতী অটাবলে ও সমসময়: শিক্ষা, স্বাবলম্বন ও মিশ্র মানসিকতা

উপমা বিশ্বাস

ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় মেয়েদের জীবনকে রাজা রামমোহন রায় মানবেতর জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মনুষ্যত্বের পর্যায়ে নারী জীবনকে উন্নীত করার জন্য বিদ্যাসাগর এবং আরও অন্যান্য মানবিক পুরুষেরা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। বাংলায় মেয়েদের জন্য ইতিবাচক কিছু সংস্কার আনয়নের কাজ ব্রাহ্মসমাজ ও সংস্কারপন্থী পুরুষেরা শুরু করেছিলেন। বাংলার বাইরে ভারতের নানা অঞ্চলে যেমন মহারাষ্ট্রে মেয়েদের শিক্ষা, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ ও স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসন নিয়ে কাজ শুরু করে প্রার্থনা সমাজ। সংস্কারপন্থী পুরুষদের পাশাপাশি পন্ডিতা রমাবাঈ ও কতিপয় মহিলা ক্রমশঃ হিন্দু মেয়ে ও বিশেষত বিধবাদের শিক্ষা, স্বাবলম্বন ও জীবনের মূল স্রোতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পার্বতী অটাবলে এমনই একটি নাম।

মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় দেবরুখ নামে ছোট একটি গ্রামে ব্রাহ্মণ কৃষক পরিবারে ১৮৭০ সালে পার্বতী জন্মগ্রহণ করেন। ঊনিশ শতকের শেষার্ধেও মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে কোনও ভাবনাচিন্তা ছিল না। বিভিন্ন সাংসারিক কাজকর্ম ও শিশুপালনের দক্ষতাই ছিল শেষ কথা। পার্বতীও এমনই এক সমাজে অক্ষর পরিচয়হীনভাবে বেড়ে উঠেছিলেন। প্রতিষ্ঠত শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট দেরী করে পেলেও বাবা মা-এর প্রভাব পার্বতীর বিশিষ্ট মননকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল বলা যায়। শৈশবে মায়ের সাংসারিক কর্ত্যব্যের বোঝা বহনের ছবি পার্বতী আজীবন মনে রেখেছেন। অন্যদিকে তার বাবা ব্রাহ্মণ হলেও ছিলেন জাতপাতের গোঁড়ামিমুক্ত ও খোলামনের একজন মানুষ। পার্বতীর জীবনকথা থেকে আমরা জানতে পারি সমাজে অস্পৃশ্য মানুষেরা ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা তাদের বাড়িতে সমাদৃত হয়েছেন। সকলের জন্যই তাদের বাড়ীতে ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য ও তৃষ্ণার জল উপস্থিত ছিল।

মেয়েদের জন্য তৈরী হওয়া সাংসারিক কর্তব্যের বোঝা টানার প্রচলিত ধারণা নিয়ে শৈশবেই পার্বতীর মনে কোথাও একট প্রশ্ন তৈরী হয়েছিল। একই সাথে ঈশ্বরবিশ্বাসী বাবার সব মানুষের জন্য সেবার ছবিও পরবর্তী জীবনে মানুষের জন্য তথা বিধবাদের জন্য কাজ করতে চাওয়া পার্বতীর সেবাব্রতী মননকে গড়ে তুলেছিল।

বিয়ের ৩ বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে পার্বতী ছোটো ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে আসেন। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিৎ অন্য অনেক সমাজের মতো হিন্দু সমাজেও মেয়েদের পরিচিতির ক্ষেত্রে বিবাহ একমাত্র মানদন্ড। কোনও সমাজেই একজন পুরুষের পরিচিতির ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ও একমাত্র মানদন্ড নয়। পার্বতী অটাবলে ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে অনেক মেয়ের মতই হিন্দু সমাজে মেয়েদের পরিচিতিগত মানদন্ডের বিষয়টি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। হিন্দু সমাজে বিধবারাও এমনই একটি বিশেষ শ্রেণীগত পরিচিতি। তাই বিধবাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণবিধি। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু সমাজেও এমনই কিছু আচরণবিধি প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে পার্বতীর জীবনকথায় সবথেকে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে বিধবাদের মাথা কামানোর বিষয়টি। জীবনসঙ্গী গত হওয়ার পর পার্বতীও এই সকল আচরণবিধি তার অন্য দুই বিধবা বোনের মতোই স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছিলেন, কোনও প্রশ্ন ওঠেনি তার মনে। শুধু মাত্র তার শিশুপুত্রের চোখে মায়ের এই আকস্মিক বেশ পরিবর্তন যথেষ্ট আঘাত ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল।

তার পরিবারে তিন বিধবা মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে বাবা মায়ের ছিল গভীর দুশ্চিন্তা। বিবাহ, স্বামী, সংসার ও সন্তান মেয়েদের জন্য এটি হিন্দু সমাজের নির্দিষ্ট ও অভ্যস্ত ছক। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ ইত্যাদির ফলে মেয়েদের জীবনের এই নির্দিষ্ট ছক কিছুটা অন্য মাত্রা পেলেও বা মেয়েদের জীবনের অন্য পরিসর তৈরী হলেও বিবাহ এখনও একটি মেয়ের সামাজিক পরিচিতির একমাত্র মানদন্ড হিসাবেই রয়ে গিয়েছে। এখনকার

ইতিহাস বিভাগ

মতো তখনও (আরও বেশী করে) বৈধব্য এই অভ্যস্ত ছকটিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করে দিত। পার্বতীর আরও দুই বোন বৈধব্যলাভ করেছিল সন্তান প্রাপ্তির আগেই। পার্বতীর বাবার ভাষায় বিবাহিত জীবনের সুখ দুঃখের কোনও অভিজ্ঞতাই তাদের হয়নি। হিন্দু সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহের রীতি না থাকায় ও বাল্যবিবাহের রীতি প্রচলিত থাকায় এই অবস্থা আরও বহু শিশুবধূর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পার্বতীর বাবা সংস্কারমুক্ত একজন খোলা মনের মানুষ। পার্বতীর এক ভাই-এর সূত্রে ডি. কে. কার্ভের সঙ্গে তিনি পার্বতীর বিধবা দিদির পুনর্বিবাহ দেন। ডি. কে. কার্ভে সমাজ সংস্কারক হবার কারণেই একজন বিধবা মেয়ের পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। ডি. কে. কার্ভে পার্বতীর জীবনে প্রথম শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। দিদি আনন্দীবাঈ ও ডি. কে. কার্ভের উৎসাহ ও ব্যবস্থাপনায় পার্বতীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল। এই সময় থেকেই অধ্যাপক কার্ভে পুণার হিঙ্গলেতে বিধবা ও অনাথ মেয়েদের জন্য একটি আশ্রম তৈরী করার চেষ্টা করছিলেন। এই আশ্রমের শিক্ষকতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পার্বতীর শিক্ষালাভের সূত্রপাত হয়েছিল। শিক্ষালাভের শেষে পার্বতী পুনরায় বিধবা আশ্রমে কাজে যোগ দেন। এই শিক্ষা ও পার্বতীকে শুধু যে স্বাবলম্বনের পথেই নিয়ে গিয়েছিল তা নয়, দেবরুখের পার্বতীর চিন্তাজগতেও বিভিন্ন পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছিল। অন্য বিধবাদের মতো ভাগ্যের উপর ভবিষ্যতকে ছেড়ে না দিয়ে নিজেই নিজের ভাগ্যকে গড়ে নেওয়ার সাহস জুগিয়েছিল। পুণার পার্বতী এখন থেকে সমাজ, দেশ, জাতীয় জীবন ও বিশেষভাবে হিন্দু বিধবাদের দুর্দশা দূরের মধ্যে দিয়ে দেশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার কথা ভেবেছিলেন।

পার্বতীর নিজের কথায় শিক্ষার ফলে ও কর্মজীবনে প্রবেশ তাকে বিধবাদের জীবন সম্পর্কে আরও প্রসারিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছিল। বিভিন্ন তীর্থ যেমন কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন মঠে একদিকে পার্বতী হিন্দু বিধবাদের দুর্দশাপূর্ণ ভিক্ষাজীবীর থেকেও অধম অসহায় ও অসম্মানিত জীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করেন। অন্যদিকে হিন্দু বৈধব্যদশার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রীতিকে একজন মহিলার পক্ষে তক্ষর যথেষ্ট অসম্মানজনক বলে মনে হতে থাকে। যেমন বিধবাদের মাথা কামানোর বিষয়টি। পার্বতী তার রচনাতে এ নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন তুলেছেন, যে শুধুমাত্র হিন্দু বিধবাদের ক্ষেত্রেই এই বিধান কেন? তিনি বহু মানুষের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছেন এবং একটি সমাধানে পৌছানোর চেষ্টাও করেছেন। এই প্রথার প্রতিবাদ হিসাবে তিনি নিজে মাথা কামানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মাথা কামানোর বিষয়টি বাধ্যতামূলক না করে একজন বিধবার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। বিধবার পক্ষে বর্জনীয় বিভিন্ন প্রকার গার্হস্থ্য সুখ সুবিধা কেন তার প্রাপ্য হবে না সে বিষয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন।

পুণায় ডঃ কার্ভের আশ্রমে পার্বতীকে একাধিক বিষয় দেখাশুনা করতে হতো। আশ্রমের জন্য চাঁদা তোলার কাজে ডঃ কার্ভেকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো। একবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় থেকেই পার্বতীর কর্মজীবন তথা স্বাবলম্বন এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করল। মহিলা ও বিধবা হওয়ার কারণে বাইরের জীবনে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত পার্বতী একা একাই পুণা থেকে দূরবর্তী ও অপরিচিত বিভিন্ন জায়গায় সভা ও চাঁদা তোলার জন্য যেতে শুরু করলেন। এই সব জায়গাতেই যাদের সাহায্য তাকে নিতে হয়েছিল লিঙ্গগত দিক দিয়ে তারা সকলেই পুরুষ। প্রাথমিকভাবে এদের অনেকের কাছ থেকেই পার্বতী উপহাস ছাড়া কোনও সাহায্য পাননি। একজন মহিলা তার উপরে বিধবা তিনি সভা আহ্বান করে শহরের গণ্যমান্য মানুষ যারা সকলেই পুরুষ তাদের সামনে বক্তৃতা দেবেন— বিষয়টি তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছিল একেবারেই অবাস্তব ও অসম্ভব। তবে চিত্রটা ক্রমশঃ বদলাতে শুরু করে। পাবতীও তার এই নতুন কর্মক্ষেত্রে বারংবার বিভিন্ন পুরুষের সাহায্য পেয়েছেন।

এই নতুন কর্মক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার জ্ঞান পার্বতীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং ড. কার্ভের ইচ্ছা ও সহযোগিতায় ইংরাজী শেখার জন্য ১৯১৪ সালে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিভিন্ন আমেরিকান পরিবারে পরিচারিকার কাজ করার মধ্যে দিয়ে তিনি ইংরাজী ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠবার চেষ্টা করতে থাকেন। এই কাজ পার্বতীর পক্ষে অনেক দিক থেকেই বেশ কঠিন ছিল। একদিকে যেমন বিদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে তাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন আমেরিকান পরিবারে একজন হিন্দু বিধবার পরিচারিকাবৃত্তি পার্বতীর নিজের কথায, আমেরিকায় বসবাসকারী তার দেশীয় ভাইদের কাছে ছিল ভারতীয়দের পক্ষে যথেষ্ট অপমানজনক। এদের মধ্যেই একজন হিন্দু ভারতীয় ছাত্র পার্বতীকে দেশে পাঠিয়ে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। বিধর্মী ও বিদেশীর বাড়ীতে হিন্দু বিধবা হিসাবে পরিচারিকাবৃত্তি--- পার্বতী নিজে কিন্তু বিষয়টিকে এভাবে দেখেননি। এক্ষেত্রে তার চিন্তাভাবনা ছিল পুরোপুরি স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত। এর মধ্যে দিয়ে বিদেশীদের কাছে তার মাতৃভূমির সম্মানহানি হচ্ছে পার্বতী তা মনে করেননি। পার্বতীর মতে তিনি সৎভাবে নিজের জীবিকার্জন করছেন। অবশেষে কে বিশিষ্ট ব্যক্তির সহায়তায় তিনি আরও বেশ কিছু সময় আমেরিকায় থেকে যেতে পেরেছিলেন। এই সময় তিনি আমেরিকার বিখ্যাত শ্রমিক নেত্রী মিস ওরিলির বাড়ীতে পরিচারিকা হিসাবে যোগ দেন। এইখানে এসে তার আমেরিকায় আসার দুটি উদ্দেশ্যই পূরণ হয়। মিস ওরিলি বিভিন্ন সভা সমাবেশে বিশেষকরে শ্রমিকদের উন্নতিমূলকসভায় পার্বতীকে নিয়ে যেতে শুরু করেন এবং বক্তা হিসাবেও পার্বতীকে

এই সকল সভা সমিতিতে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেন। পার্বতী বিভিন্ন সভা সমাবেশে পুণার ডঃ কার্ভের বিধবা আশ্রম সম্পর্কে মহিলা ও পুরুষ শ্রোতাদের জানান। বহু আমেরিকান নরনারীর সাথে পার্বতীর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। পুণার আশ্রমের জন্যও পার্বতী বহু চাঁদা তুলতে সমর্থ হন। বিশেষত ওরিলির সামগ্রিক জীবন তাকে মুগ্ধ করেছিল। শ্রমিকনেত্রী ওরিলি অবিবাহিত ছিলেন এবং ৮১ বছর বয়স্ক মায়ের সঙ্গেই থাকতেন। তিনি একদিকে মেয়েদের একটি স্কুল পরিচালনা করতেন এবং সমগ্র জীবন তিনি শ্রমিকদের উন্নতির জন্যই ব্যয় করেছিলেন। পার্বতী তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন আমেরিকায় মেয়েদের জীবনে বিয়েই একমাত্র অবলম্বনের উপায় নয়। ওরিলির মতোই আরও বহু আমেরিকান মেয়ে বিয়ে না করেও স্বাবলম্বী হয়ে সম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করে। তিনি এই প্রসঙ্গেই তার নিজের দেশের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে যেখানে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়েটা একটা বাধ্যতামূলক বিষয় করে তোলা হয়েছে, তার সঙ্গে আমেরিকার উদার চিন্তভাবনার প্রশংসা করেছেন ও এদেশের মেয়েদের ক্ষেত্রে আমেরিকাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ বলে মত প্রকাশ করেছন।

জীবনের বিভিন্ন পর্বে নানা ঘটনা, বর্হিজীবনে তথা কর্মজীবনে বিভিন্ন মানুষের সাথে মেলামেশা ও সর্বোপরি শিক্ষালাভ একদিকে যেমন পার্বতীর সংস্কারমুক্ত মননকে গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে পার্বতীর নিজের কথা অনুযায়ী তার পুরানোপন্থী চিন্তধারাকে তিনি কখনই ত্যাগ করেননি। মাথা না কামিয়ে ও স্বাভাবিকভাবে পরিচ্ছদ পরিধান করে পুনরায় পার্বতী নিজেই হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন ও বহু মানুষের নিন্দার সম্মুখীনও হয়েছিলেন। কিন্তু বিধবা আশ্রমের জন্য চাঁদা তোলার কাজে, বক্তৃতায় পার্বতী এদেশের মেয়েদের জন্য হিন্দুসমাজের আচরণবিধি মেনে চলার নির্দেশ দেন ও বিশেষত মেয়েদেরও পশ্চিমের অনুকরণে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান না করার মত জানান। তার এই বক্তব্য হিন্দু পুরুষদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল পার্বতী একথা জানাতে ভোলেননি। জীবনের সংকটময় মুহূর্তে প্রফেসর কার্ভের অনুপ্রেরণায় শিক্ষা ও স্বাবলম্বন লাভ করলেও ১৯২৮-এ যে পার্বতী আমার কথা (মাঝি কাহানী, মারাঠী ভাষায়) লেখেন, মেয়েদের শিক্ষা ও স্বাবলম্বন বিষয়ে তার কাছ থেকে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর শুনতে পাওয়া যায়। ১৯২৮-এর পার্বতীর মতে আদর্শ জননী ও গৃহবধু হওয়ার জন্যই মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। বাড়ীতে স্বামীর অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অফিসে বসের অধীনতা উচিৎ না। তার মতে প্রফেসর কার্ভের মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য মেয়েদের ভালো মা ও গৃহিনী হিসাবে তৈরী করা। মেয়েদের শিক্ষা টাকা উপার্জনের জন্য নয়— এটাই তিনি মনে করেন। পার্বতীর মতে মেয়েদের স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে বিয়ের পর ভালো মা হওয়া ও সুন্দরভাবে সংসার চালানো। মেয়েদের অধিকার অর্জনের জন্য তিনি ইউরোপের বা পাশ্চাত্যের আদর্শ যে গ্রহণ করা উচিৎ নয় সেই মত দিয়েছেন। যে কোনো ভাবেই যেন মেয়ে ও পুরুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বাতাবরণ তৈরী না হয় সে ব্যাপারে পার্বতী তৎকালীন সামাজিক নারীবাদীদের মতই সতর্ক ও সরব। শিক্ষা ও কাজকর্ম সবক্ষেত্রেই মেয়েদের জন্য আলাদা গন্ডী আঁকতে পার্বতী সচেষ্ট হয়েছেন অথচ কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে পুণার আশ্রম ছেড়ে দূরবর্তী এলাকায় একক ভ্রমণ, দূরবর্তী জায়গায় একক ভ্রমণ, বিধবা আশ্রমের জন্য সভা আহ্বান ও অগণিত পুরুষ শ্রোতা ও দর্শকবন্ধুদের সামনে পর্দার বা অবগুণ্ঠনের আশ্রয় না নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরা ও চাঁদা সংগ্রহ, আমেরিকায় বিভিন্ন অপরিচিত ব্যক্তিদের গৃহে পরিচারিকার বৃত্তি গ্রহণ, জীবিকার্জনের জন্য পুস্তক ফেরী করা পার্বতীর এই সকল কাজই তার সকথিত মেয়েদের জন্য গন্ডীটিকে বারবার ভেঙেছে। কিন্তু তথাপি পাবর্তীও আরও অনেকের মতোই পুনর্বার সেই বিশিষ্ট গন্ডীটি রচনা করতে ব্যস্ত থেকেছে।

মনের মুখোমুখি

রাণু ঘোষ

জীবনে জটিলতা বেড়েছে। একসঙ্গে অনেক কিছু মনে রাখতে হচ্ছে। ইদানিং সেই চাপেই বোধ হয় বেশী করে ভুলে যাচ্ছি আমরা। সোজা কথায়, যেটা মনে রাখতে চাই সেটাই মনে থাকে, যেটা চাইনা, সেগুলো ভুলতে বসি। পার্সে টাকা নিতে ভুলে যাওয়াটা সিলি মিস্‌টেক হলেও, আলমারিটা খুলে তারপর বন্ধ করার সময় চাবি নিতে ভুলে যাওয়া, রিসেন্ট যিনি গর্ভপাত করিয়েছেন তার বার্থ কন্ট্রোল পিল্ নিতে ভুলে যাওয়া— এর পিছনে উদ্বেগ, অবসাদ, দীর্ঘদিনের মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতা, সম্পর্কের মর্মান্তিক টানাপোড়েন, নেশা, পারিপার্শ্বিক চাপ-এর মতো নানা কারণ রয়েছে। এগুলি মানসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এর জন্য আমরা অ্যালজাইমার্স-কেও দায়ী করি।

অতি ইচ্ছার চাপে বা বহু বাসনায় পরীক্ষার সময় সব পড়া আপ্রান মনে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায় পড়ুয়ারা, কিন্তু সমস্তটা মনে থাকে কই? তখন প্রশ্ন জাগে, চাইলেও কেন মনে রাখা যাচ্ছে না! এ কেমন গেরো? আবার আকস্মিকভাবে মনে কোনও আঘাত পেলে, চোখে দেখলে বা কানে শুনলে তার পরবর্তী পর্যায়ে মনের মধ্যে ওই অভিজ্ঞতা ফিরে ফিরে আসে। যেমন- যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সম্পর্কের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না সহজে। কাউন্সেলিং, সাইকোথেরাপি, মন চিকিৎসা আর স্যোশাল সাপোর্ট— আদৌ কি এগুলো ভুলে না যাওয়ার দাওয়াই; নাকি অবসাদ এভাবেই বিদায় নেয়!

জীবনের নানা চাপ ও টেনশনযুক্ত পরিস্থিতিতে মনস্তাত্বিক বিকৃতি ঘটে চলেছে বার বার। শিক্ষার্থীর পড়ার চাপ, আনুষঙ্গিক আধুনিক জীবনের প্রলোভন, অসম অর্থনীতির প্রভাবে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, অফিসে প্রতিযোগিতা, নানান রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি, সামাজিক স্বীকৃতির দ্বন্দ্ব, মানুষের মনস্তত্ত্বকে প্রতিনিয়ত বিকৃত ও চিত্তকে বিকল করে তুলেছে। এক্ষেত্রে দরকার— মানুষকে প্রকৃত পরামর্শ দেওয়া, সমস্যার বিশ্লেষণ করে মানুষের পাশে থাকা (ব্যক্তিগত চাহিদা না রেখে)। আমার আত্মবিশ্বাস সুপাঠ্য বেশ কিছু বই— এ বিষয়ে বিশেষ সহযোগিতা করতে পারে।

যারা সত্যিই রবীন্দ্রনাথের সেই 'অতি ইচ্ছার সঙ্কট ও আধা ইচ্ছার সঙ্কট'-এ তাদের জন্য একটা 'চোখের বালি', একটা 'বনলতা সেন' প্রয়োজন বৈকি!

তবে মনের সন্ধান করতে, সময় বাঁচানের তাগিদ থাকা চাই, একাধিক পন্থাই আছে— ১. নির্দিষ্ট কাজের বিষয়ে ফোকাস্ থাকতে হবে, নিজেকে বলে দিন, ঠিক কী চান নিজের থেকে। ২. প্রাধান্য অনুযায়ী কাজ কাজগুলো ভাগ করে নিতে হবে কোনটা আগে কোনটা পরে। ৩. কাজভিত্তিক দৈনিক বা সাপ্তাহিক নোট রাখাই যায়। ৪. যেন কোনও কিছুতেই অনুশীলনে ঘাটতি না থাকে, তা হলেও তো কাজ করতে গিয়ে সময়ের অপচয় হবে। ৫. এখন তো দৈনন্দিন ঘটনা— জীবনের ডেডলাইন গুলোই মিস করে যাচ্ছি ফেসবুক-হোয়াটস্‌অ্যাপ-টুইটার অ্যাডিকশনের জন্য। সেক্ষেত্রেও সময়টা নির্দিষ্ট করা চাই। ৬. নিজের সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করাটা বোধ হয় জরুরী, দিনের শেষে আমরা সবাই নিজের সাথে একটু একলা হই না কি?

বিবেকানন্দও সে যুগে বলেছিলেন--- ''মন চল নিজ নিকেতনে''। আজও আমরা সেই অতীতেই ফিরিনি, আমাদের বর্তমানও নেই, তাহলে স্মৃতি কী? ভুলি কী? মনে রাখতে চাই কী? ভবিষ্যৎ কী? নাথিংস? আমাদের মনের মাথা ঘামানোর কোনও অধিকার নেই এ যুগে!

... না, তেমন শক্তিমান বুদ্ধিজীবী আমি নই, আমি যুবতী, আমি মানবী, আমি চাই বিস্ময়ে একলা ভাবার আবেগ, আমি চাই বন্ধু-মন, আমি চাই স্মরণ-স্মৃতি, আমি চাই 'মনে'-র মানুষ।

সবশেষে--- 'সুচেতনা'র সেই কবির কথায়,—

'সব পাখি ঘরে ফেরে - সব নদী— ফুরায়
এ জীবনের সব লেনদেন;/ থাকে
শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার
বনলতা সেন'।

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

যুগবিপ্লবের সন্তান শিবনাথ শাস্ত্রী

সবিতা মন্ডল

ঊনবিংশ শতক শুধু নবজাগরণের শতক নয়, সেই সূত্রে কিছু মানবপুত্র আমাদের সমাজ ও সাহিত্যাঙ্গনে এসেছিলেন যাঁরা আমাদের জীবনে অনেক অবদান রেখেছেন। যুগবিপ্লবের সন্তান হিসাবে, জন্ম নিয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। যে যুগে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন, সেই যুগ যন্ত্রনার চিহ্ন তাঁর গোটা জীবনে পরিস্ফুট। তিনি তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে পুরাতন হতে নতুন যুগে উত্তরণের কাহিনীকে স্পষ্ট করেছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মেছেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে। যুগের প্রভাব ও অন্তরের টানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। ফলত বাবা-মা-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়, পরিচিত সমাজ ও শিক্ষাবিভাগের চাকরীও ছাড়েন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হ'ল, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা। তাঁর প্রথম কিছু রচনা ছাড়া প্রায় সমস্ত লেখা ঈশ্বরানুরক্তি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ এবং জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রাহ্মসমাজের হয়ে কাজ করবেন বলে লিখেছিলেন—

'আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই,
নিজে ত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।
সত্য ধন মান চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাছে আসি তবে বেঁচে যাই'।

মায়ের মুখে রামায়ণ আবৃত্তি তাঁকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও তাঁকে মুক্ত করত। তাঁর মামা ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যিনি 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এখানে তিনি লেখা চর্চার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্যারীচরণের 'এডুকেশন গেজেট'-এও তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখেছিলেন, ইংরেজ মেয়ের গুণকীর্তন করে—

'ধবলাঙ্গী তাম্রকেশী বিড়াল লাচনা,
বিবাহ করিব সুখে ইংরেজ-ললনা'।

'নির্বাসিতের বিলাপ' রচনা তাঁকে কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। ভীষণ অপরাধের জন্য শাস্তি হিসাবে ভবানীপুর বাসিন্দা এক ভদ্রলোক আন্দামানে নির্বাসিত— এই কাহিনী প্রথম বের হয় সোমপ্রকাশ, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালে।

১৮৪৭ সালে তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৯১৯-এ, স্বভাবতই মধুসূদনের প্রভাব তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। 'নির্বাসিতের বিলাপ' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাস্তবিক তখন আমার কবিতার মধ্যে একটু নতুনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না, কিন্তু দুই-এর মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী করা হইয়াছিল। প্রধানত এই জন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল'।

১৮৭৫-এ 'পুষ্পমালা' প্রকাশ পায়। এই কবিতা সংকলনের কবিতা হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিকাশে সজীব। কবিতাগুলি আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ বলেই কবি বলতে পেরেছেন, 'ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে'। তাঁর প্রথম কবিতা 'গভীর নিশীথে' থেকে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে অন্ধকার রাতে যে বিস্ময় তা পাঠকও বুঝতে পারে—

'কী ঘোর গভীর নিশি, আধার সাগরে
মগ্ন ধরা; চারিদিকে এমনি সুস্থির,
প্রহরী কুকুর ডাকে .....
.....
অগাধ জলধিতলে - শৈবাল - কুহরে
কীটানু নিবসে যথা - আমি সেইরূপ
আঁধার সাগর গর্ভে - আপন - কুটীরে
ডুবে আছি।.....'

এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'চৈতন্যের সন্ন্যাস'

'হিমাদ্রি কুসুম' শিবনাথ ১৮৮৭ হিমালয় ভ্রমণে গিয়ে লিখেছিলেন। 'দীক্ষা', 'সৌন্দর্য', 'বিচ্ছেদ'-এর মধ্যে দীক্ষা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের ঘটনা নিয়ে লেখা। 'পুষ্পাঞ্জলি' ১৮৮৮ সালে লেখা বিভিন্ন পুষ্পের অঞ্জলি। তার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'ছায়াময়ী পরিণয়' (১৮৮৯) একটি রূপক কাব্য। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনকে কবি এখানে রূপকের সাহায্যে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। কবিতায় ছায়াময়ী সংসাররূপ বৃদ্ধের কন্যা।

বাংলা বিভাগ

পরমপুরুষের আহ্বানে আনন্দধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে সাধনা ও কামনার সাহায্যে পরমপুরুষের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। কিন্তু ছায়াময়ী আত্মমুক্তির কথা ভাবেনি। পরমাত্মার সংস্পর্শে শক্তি লাভ করে সংসারে ফিরে এল মানবসেবার ব্রত নিয়ে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর কবিতা বেশির ভাগ সমকালীন জীবন ও তাঁর নিজের জীবনের সুরে বাঁধা। তবে মুস্কিল একালের পাঠকরা যুগমানসিকতাকে পেরোতে পারবে না। কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর কবিতায় ছোট সংকলন শিব-নির্মাল্য (১৯২০) বের করেন, যা আজকের পাঠকরাও মনে মনে গ্রহণ করতে পারবে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর কর্মে ও জীবনে দেশপ্রেমী ছিলেন। তিনি ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে দেশপ্রেমকে মেলাতে চেয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাই লিখেছিলেন— 'শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মধর্মে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ..... শিবনাথ শাস্ত্রীই সর্বপ্রথম স্বদেশের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবার রীতি ব্রাহ্মোপসনাতে প্রবর্তিত করেন।

'তব পদে লই শরণ।
আর্যদের প্রিয়ভূমি সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে, অচেতন হে।
একবার দয়া করি তোল করে বীর
দুর্দশা আঁধার তার করহ মোচনা।
.....
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে;
সেই কৃপাগুণে দেখি শুভক্ষণ
সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন।'

পরাধীন দেশের দুর্দশার কথা ভেবে কবির চোখে ঘুম নেই। তিনি আক্ষেপ করেছিলেন পড়াশুনা শিখেও অনেক মানুষ মাতৃভূমির দুঃখ মোচনের জন্য আগ্রাহান্বিত নয়। তিনি এক কবিতায় বলেছেন—

'জ্ঞান পেয়ে যারা হয়েছে শিক্ষিত
দেশের দুর্দশা তারাও বিস্মৃত;
জঘন্য আমোদে দেখি কাল হবে,
অকারণে বকে, হাসে হাহা করে,
নীচ পশুপ্রায়, ইন্দ্রিয় সেবায়
মগ্ন নিরন্তর .....।'

শিক্ষার পরিণতি দেখে তিনি আধুনিক সভ্যতার ওপর বিরক্ত হয়ে বলেছেন—

'চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি,
দেও ধর্মধন প্রাণে পুরে রাখি।'

কখনও—

'যাক এ সভ্যতা দেও সে বিশ্বাস,
দেও সে নির্মল হৃদয় আকাশ,
দেও সে বৈরাগ্য ভারত সৌভাগ্য
আমি পুনরায় ধর্ম লয়ে মাতি।'

এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালী' কাব্যের 'সভ্যতার প্রতি' কবিতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে হবে—

'বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ,
তবে যে জাগিবে ভারত-সন্তান ....'।

সমস্ত ভারতবাসীকে আহ্বান করেছেন—

'আয়রে বোম্বাই! আয়রে মাদ্রাজ
বৃথা গন্ডগোলে নাহি কোন কাজ
ভারতের তোরা অমূল্য রতন,
আয় সবে মিলি করি জাগরণ;
ভাই মহারাষ্ট্র! তোমার কপালে
পৌরুষের আভা আছে চিরকালে,
দাঁড়াও আসিয়া কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা বাড়ুক আমার .....
আয় রাজপুত, আয় প্রিয় শিক,
জাতি-ধর্ম-ভেদ সকলি অলীক,
ভারত রুধির সবার শরীরে,
ভাই বলে নিতে তবে শঙ্কা ফিরে।
সবে বলে জয় ভারতের জয়
সুখ সূর্য ওই হইল উদয়।'

জন-গণ-মন রচনার প্রায় ৩৬ বছর পূর্বে শিবনাথের কলমে ধ্বনিত হয়েছিল। গাঁধীজী সত্যাগ্রহীর চরিত্রশুদ্ধির ওপর যেমন জোর দিতেন, তেমনি শিবনাথ শাস্ত্রী ত্যাগ ও সংযম সাধনের পথেই স্বরাজ সাধনার কথা বলেছেন—

'ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বার মাস,
দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়।'

যে কোন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মতো উপন্যাসও সমকালীন সমাজের এক আর্থ-সামাজিক দলিল। গ্রাম ও শহরের মধ্যে তাঁর উপন্যাসে গ্রামকেই জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন বেশি। আসলে তাঁর গ্রামের প্রতি মমতা বেশি ছিল। নয়নতারা ছাড়া অন্য তিনটি উপন্যাসের গতি গ্রাম থেকে শহরের দিকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মেজ বৌ' (১৮৮০) আট-দশ দিনের মধ্যে লেখা। উপন্যাসটি নায়িকা প্রধান। নায়িকা প্রমদা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য শাশুড়ির সমালোচনার মুখে পড়ে। উকিল স্বামী কলকাতায় সংসার পাতলে প্রমদাও সেখানে আসে, সঙ্গে সঙ্গে জীবনে কঠোর আঘাত আসে। কন্যা লীলার মৃত্যু! নবজাত পুত্রের মৃত্যু, নিজেও কঠিন রোগ থেকে অব্যাহতি পেলেও স্বামী যক্ষা আক্রান্ত হয়। চিকিৎসার খরচে কুলিয়ে উঠতে পারা মুস্কিল। স্বামীর মৃত্যুর পর রিক্ত হস্তে পিতৃগৃহে আশ্রয়— এই হল কাহিনী। লেখক প্রমদার এ দুর্ভাগ্যকে একটিমাত্র

যুক্তি দিয়ে তার প্রতি নিষ্ঠুরতাকে সমর্থন করেছেন, যে কিছু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরও অসহ্য ক্লেশ সহ্য করতে হয়। কিন্তু তাতে তার ধর্মানুরাগের জ্যোতি ম্লান না হয়ে দ্বিগুন উজ্জ্বলতা ধারণ করে। দুঃখ পেয়েও না ভেঙে পড়ে ঈশ্বরের পথে থেকেছেন তাই সে আদর্শ চরিত্র। মূলত বাস্তব সমাজ চিত্র এই উপন্যাসের গৌরব। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৮৭ সালে 'শান্তিমঠ' নামে একটি উপন্যাস এই উপন্যাসের উপসংহার হিসেবে লেখেন। এছাড়া মিরিয়ম নাইট 'মেজবৌ'-এর ইংরাজী অনুবাদ করেন ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে।

পরবর্তী উপন্যাস 'যুগান্তর' ১৮৯৫ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করেছিল। সমাজচিত্র, চরিত্র চিত্রণ এবং রচনাশৈলী অনেক উন্নত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'লেখক বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর নাম আস্ত একটা গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে এরূপ গ্রামজীবন ও তার জীবন্ত চিত্র খুব কম আছে। তর্কভূষণের টোল, হাঁসের দল, চিমু ঘোষ, জহরলালের ইতিহাস আমাদের পরিচিত হয়ে উঠেছে। 'নয়নতারা' ১৮৯৯ শিবনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'মেজবৌ' ও 'যুগান্তর' নব যুগের দ্বন্দ্ব ও সমস্যায় পীড়িত। নয়নতারা তা থেকে মুক্ত। উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য প্রেম এবং হৃদয়ের সংঘাত। নয়নতারা ও তার বোন সৌদামিনী অবিবাহিতা শিক্ষিতা তাই প্রেম স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। এই উপন্যাসে গ্রামের চিত্র নেই। প্রধান কেন্দ্র চুচুঁড়া তবে কলকাতা অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। নয়নতারা হরেনকে ভালবাসে কিন্তু অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি নেই বলে বিবাহ হয় না। দাদার ইচ্ছা না থাকার জন্য নয়নতারাও হরেনকে 'অসার' প্রেম থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের বিজয়াকে মনে করিয়ে দেয়। এই উপন্যাসটি শিবনাথের এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। হৃদয়ের গভীর অনুভূতি প্রকাশের উপযোগী ব্যঞ্জনাময় ভাষাতে লেখক দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'নয়নতারা' গল্পপ্রধান।

তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬), 'মেজবৌ' এবং 'যুগান্তর'-এর ধারা নিয়েছে। গ্রাম, সমাজ, সংস্কার, ধর্ম, নবজীবনের আকাঙ্খা এখানে বড় হয়ে উঠেছে। ছেলে মহেশ কঠোর দাবিদ্রতার মধ্যে দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়। এটি একটি বাস্তব চরিত্র। এই উপন্যাসের আর একটি অসম্পূর্ণ খসড়া সম্পূর্ণ ও পরিমার্জিত করে লেখকপুত্র তাঁর মৃত্যুর পর 'উমাকান্ত' (১৯২২) নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন।

প্রবন্ধকার শিবনাথ শাস্ত্রী সমকালকে তুলে ধরেছেন প্রবন্ধে। ১৯১৮ সালের 'আত্মচরিত' শিবনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি এই বইটি লেখেন। নিজের কথা বলতে গিয়ে নিজের স্তুতি না করে নিজেকে পিছনে রেখে সমকালীনতাকে প্রকাশ করেছেন। বহু ঘটনা ও ব্যক্তিকে এনে সামাজিক ইতিহাসকে জীবন্ত করেছেন। তাঁর মানব প্রীতিই এর মূলে কাজ করেছিল।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪) শিবনাথ জীবন অপেক্ষা সামাজিক ইতিহাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'রামতনু লাহিড়ী' ও 'আত্মচরিত' দুটিই বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস রচনা করেছে। তথ্যগত কিছু ত্রুটি থাকলেও ইতিহাস-চেতনা তাঁর প্রবল।

'প্রবন্ধাবলির' (১৯০৪) উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের নিদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সামাজিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত, জাতীয় উদ্দীপনা, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'স জীবতি মনো যস্য মন নেল হি জীবতি।' কথাটি বিদ্যাসাগরের নামে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বাস করতেন পরাধীন দেশে জাতীয় উদ্দীপনা বিস্তার করবার প্রধান উপায় সাহিত্য। তিনি বললেন সাহিত্যের একটা কলা ও সৌন্দর্যের দিক আছে কিন্তু তা অনুষঙ্গ মাত্র, মূল কথা হ'ল হৃদয় হতে হৃদয় ভাবের সঞ্চালনা। ছাত্রসভা ও বিভিন্ন স্থানের বক্তৃত্বতার সংকলন— 'বক্তৃতা শতবক' (১৮৮৮) গভীর সমাজবোধ ও ধর্মপ্রাণতার দ্বারা চিহ্নিত। 'সমাজ রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি' এবং 'ধর্ম কি!' এই দুটিই উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। তাঁর বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ দান ধর্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধগুলি ধর্মজীবন (১৮৯৯) মাঘোৎসবের বক্তৃতা (২ খন্ড, ১৯০৩-০৩) গৃহধর্ম (১৮৮১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার সংকলন হল ধর্মজীবন। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ও বাইবেল থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি তাঁর রচনাকে হৃদয়গ্রাহী করেছে।

গৃহধর্মের মতো জাতিমূলক একটি গ্রন্থের আজ খুবই প্রয়োজন ছিল। গৃহে রমনীর স্থান সম্পর্কে তিনি বলেছেন— 'রমনী গৃহধর্মের লবণস্বরূপ, তাহার অভাবে গৃহধর্মের স্বাদ থাকে না। 'ইংলন্ডের ডায়েরী' টুকরো লেখা, যেখানে শিবনাথের অন্তরঙ্গ পাওয়া যায়। মনুষ্যত্বের আদর্শ কি হওয়া উচিত তা বলেছেন— 'জ্ঞানে গভীরতা প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যে দৃঢ়তা, মানমপ্রেম এবং ভগবানে ভক্তি অত্যাবশ্যক। তিনি ইংরেজীতেও 'হিস্টরি অব দি ব্রাহ্মসমাজ' ২খন্ড (১৯১১-১২)। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের জন্য বইটি প্রয়োজনীয়।

সম্পাদনার কাজে শিবনাথ হাত পাকিয়ে ছিলেন 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনায় মামাকে সাহায্য করে। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেবার পর 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ানের' সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। সমাজের বাংলা মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' শিবনাথ প্রথম সম্পাদনা করেন ১৮৭৮ সালের ৩১শে মে। ইংরেজী মুখপত্র ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সম্পাদকও ছিলেন শিবনাথ। কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' সুরাপান বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একটা মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন ১৮৭২ সালে। ১৮৭৩-এ 'সমদর্শী অর দি লিবারেল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চার বছর পরে শিবনাথ

সমালোচক নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কেশবচন্দ্রে কন্যার বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করা এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। প্রমদাচরণ সেন বালক-বালিকাদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'সখা' বের করতেন। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী তাঁর মৃত্যুর পর শিবনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি শিশু মাসিক পত্রিকা 'মুকুল' (১৮৯৫)। এছাড়া অনেক গল্প ও প্রবন্ধ ছেলেদের জন্য লিখেছিলেন। সরস গল্পের সংকলন ১৯০৮ — ছোটদের গল্প (১৯৬০)।

শিবনাথ শাস্ত্রী তত্ত্বজ্ঞানী বা ভগবদ্ ভক্ত নন। তিনি শব্দ সম্পত্তিশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি। গভীর মানব প্রীতি তাঁকে কর্মের পথে নিয়ে গিয়েছিল। মূলত ব্রাহ্মসমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর জীবনের ব্রত। তাঁর জীবনে মানব প্রীতির জন্যই তাঁকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন— 'দারুন সংগ্রামে জীবন গিয়াছে, মাতাপিতার সঙ্গে সংগ্রাম, এরূপ নানা সংগ্রামে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ শিবনাথ শাস্ত্রীকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'বঙ্গসমাজকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবে না, কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে'। শিবনাথের প্রথমে মানুষ তৎপরে সাহিত্য এই ভাবনা ছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে যোগসূত্র তিনি রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আজকাল শিবনাথের নাম প্রায়ই অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্তি ও কর্মসাধনা অনুজ্জ্বল মোটেই ছিল না। পরবর্তী লেখকদের সৃষ্টির পথ— অনেকটা মসৃন হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন।

জলতরঙ্গের আবহ ফুটে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে মায়ের ডাক শোনা যায়।]

বিদিশা: (মঞ্চের বাইরে থেকে) টুকাই মুখস্থ হল, এখানে অনেকক্ষণ থেকে স্যার বসে আছে।

ঠাকুমা: যাও টুকাই যাও, আমি বরং অন্যদিকে যাই আর এই নাড়ুগুলো তুমি খেও না। তোমার তো অ্যাসিড হবে।

টুকাই: না ঠাম্মা তুমি যেও না, তুমি চলে যেও না, আমার খুব কষ্ট হবে।

ঠাকুমা: (চলে যেতে থাকে আর মুখে বিড় বিড় করতে থাকে) ডাক্তার হতে হবে। ইঞ্জিনিয়র হতে হবে। (অন্যদিকে টুকাই কাঁদতে কাঁদতে বসে যায়) পিছনে আবহে ''এই আকাশে আমার মুক্তি গানটা ভেসে আসে)

[টুকাই-এর জোনটাতে আলো নিভে যায়, অমলের ওপর আলো এসে পড়ে]

অমল: দেখেছ তো পণ্ডিত হবার কী সমস্যা, আমি ওই জন্যই তো পণ্ডিত হতে চাই না, থাকত যদি পক্ষীরাজের ঘোড়া, তাহলে আমি আর টুকাই দুজনে ঘোড়া ছুটিয়ে সেই ক্রৌঞ্চদ্বীপে চলে যেতাম। পাঁচমুড়া পাহাড়ে উঠে ঝরণা দেখতাম, শ্যামলী নদীর ধারে গিয়ে রাখাল বালকের সঙ্গে আলাপ করতাম, কিন্তু টুকাই এর মা টুকাইকে বুঝতেই চায় না।

[এরই মধ্যে বিভিন্ন জোরাল আওয়াজে পিছনের রস্ট্রাম দিয়ে তাসের দল ঢোকে, গান গাইতে গাইতে অদ্ভুত মিউজিক হয়, তারা কেউ রুইতন হরতন,]

অমল: (তাসের দলের দিকে তাকিয়ে) তোমরা কারা, আজব পোশাক পরা?

দল: আমরা তাস, দূর দেশেতে আমাদের বাস।

অমল: তোমরা এরকম অদ্ভুত আওয়াজ করে কোথায় চলেছ?

দল: বিগবাজার, বিগ বাজার, বিগ বাজার।

অমল: এ আবার কেমন বাজার, শুক্রবারে বুড়ো শিবতলার মাঠে শুধু হাট বসে জানতাম, এ বাজারের নাম তো শুনিনি।

দল: ভাল খাবার, জামাকাপড়, সিনেমা।

অমল: মানে একসঙ্গে সব পাওয়া যাবে?

দল: টাকা পয়সা, টাকা পয়সা, টাকা পয়সা।

অমল: টাকা দিলে সব পাওয়া যাবে, সব কিছু দেখা যাবে, আমি যা যা চাই সব সব পাওয়া যাবে?

দল: যাহা চাই তাহা পাই।

মানুষের পয়সা নাই (বলতে বলতে চলে যায়)

অমল: দারুণ ব্যাপার তো, তার মানে আমি, টুকাই টাকা দিলেই আমাদের ক্রৌঞ্চদ্বীপ দেখাবে, শ্যামলী নদীর ধারে নিয়ে যাবে, ঐ যেখানে নীল আকাশটা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, পয়সা দিলে সেই আকাশের কাছে নিয়ে যাবে।

[অন্য উইংস দিয়ে একদল নারী গান গাইতে গাইতে ঢোকে, 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত', কিন্তু গানের সুরটা অনেকটাই আধুনিক।]

অমল: এ কী এ তোমাদের কেমন গান, না আছে সুর, না আছে ছন্দ, কানে কেমন বেখাপ্পা লাগে।

১ম জন: আমরা চেনা সুরকেই ভাঙ্গি, অচেনা করে তুলি।

২য় জন: পুরাতন যা কিছু আছে, ধুয়ে মুছে ফেলি।

৩য় জন: নূতনের দিকে এগিয়ে চলি।

অমল: তাতে সুর থাকে, প্রান থাকে, আনন্দ থাকে।

২য় জন: নাই বা থাকল নতুন কিছু তো হল, একেবারে অন্যরকম, অন্যস্বাদের অন্যধরনের, একেবারে আমাদের মত।

অমল: ও তোমরা পুরাতনকে ভাঙিয়ে নতুন কিছু করছ, ভাল। তা তোমরা সার বেঁধে কোথায় চলেছ?

দল: সাউথ সিটি, সাউথ সিটি, সাউথ সিটি।

অমল: ঐ বিগবাজারের মত, যেখানে একসঙ্গে সিনেমা, খাবার, জামাকাপড় পাওয়া যায়।

দল: ঠিক তাই ঠিক তাই।

অমল: আচ্ছা ওখানে টাকা দিয়ে ক্রৌঞ্চদ্বীপ দেখা যাবে, পাঁচমুড়া পাহাড় শ্যামলী নদী, লাল রঙের রাস্তা, সবুজ মাঠ, জটাই বুড়ি, এ সমস্ত কিছু দেখা যাবে।

দল: পাঁচমুড়া পাহাড়, শ্যামলী নদী, ক্রৌঞ্চদ্বীপ What Rubbish

চলভাই আমাদের সময় যায়। (নূতনের দল বেরিয়ে যায়)

অমল: আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রানে গানটা গাইতে গাইতে নিজের জায়গায় এসে বসে। সব কেমন পাল্টে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে ভালো লাগার জিনিসগুলো। সব কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। মাঠের সবুজ যেন সবুজ নয়, নীল আকাশ যেন নীল নয়, সবাই যেন একটা অন্যদিকে ছুটছে, কীজানি কি পাবার আশায়, অথবা পাবে না জেনেও যেন ছুটছে, ছুটছে, কেউ কাউকে ধরছে না, অথবা ধরতে পারছেনা।

(নেপথ্য থেকে দইওয়ালা ঢোকে, গান গাইতে গাইতে)

দইওয়ালা: দই চাই দই, পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলার শ্যামলী নদীর ধারের গয়লাদের বাড়ীর দই।

অমল: ঐ যে দইওয়ালা আসছে, ওকে গিয়ে বলি আমার দুঃখের কথা, ওই আমাকে বুঝতে পারবে।

দইওয়ালা: দই, দই চাই। কি গো অমল কেমন আছ?

অমল: ভাল না গো, খুব দুঃখ আমার।

দইওয়ালা: দুঃখ, কিসির দুঃখ? (বসে)

অমল: আমার সব ভালো জিনিসগুলো কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে, সবাই ছুটে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইছে না, কেউ আমার সঙ্গে শ্যামলী নদীর ধারে যেতে চাইছে না, রাখাল বালকের সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে না, সব পাল্টে যাচ্ছে কেমন, পুরোনো সেই গন্ধ নেই, রঙ নেই, কেমন যেন ঠেকছে আমার কাছে।

দইওয়ালা: ঠেকবেই তো, সবাই কী আর অমলের মতো হতে পারে, দেশটাই উচ্ছন্নে চলে গেছে, এই আমার কথাই ধরো না, আগে এই দই কত বিক্রী হয়েছে আর এখন কেউ খেতেই চায়না, কি যে সব উঠেছে পিজ্জা, বার্গার, পপকর্ণ ছেলেমেয়েরা এখন ওগুলোই খাচ্ছে।

অমল: আচ্ছা দইওয়ালা তুমি যে আমাকে সুরটা শিখিয়ে দেবে বলেছিলে ঐ যে দই দই ভালো দই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শ্যামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ীর দই।

দইওয়ালা: এই সুর কী আর শেখবার সুর, আমি তো ভাবছি এই সুরকে পাল্টে ফেলব, এই সুর আর চলে না। বাজার ধরবার জন্য আমাকে অন্যসুর ভাবতে হবে।

অমল: বাজার ধরবার জন্য সে কেমন।

দইওয়ালা: এই যা চলছে এখন সেই সূরে, এই যেমন ধর (চিন্তা করে) আমি গাই তুমি শুনবে?

অমল: হ্যাঁ শোনাও।

দইওয়ালা: (দইওয়ালা নিজের নাক ধরে) দই চেখে যা একবার চেখে যা, চেখে যা, চেখে যা....

অমল: ছিঃ ছিঃ কী বাজে সুর, তোমার দই দেখো কেউ কিনবে না, আমি তো কিনবই না।

দইওয়ালা: কিছু করার নেই অমল, এখন এই সুরই সবাই শুনছে, মানে বলতে পারো বাজারে খাচ্ছে, আমরা সবাই বিক্রী হয়ে যাচ্ছি, আমাদের সুর, আমাদের গান, আমাদের কথা, সব এখন ওরা পরিচালনা করছে, আমাদের নিজেদের কিচ্ছুটি নেই, একদিন দেখবে তুমিও তোমরাও বিক্রী হয়ে গেছ, আমিও বিক্রী হয়ে গেছি (থেমে থেমে সুর করে) দই চাই, দই পাঁচমুড়া পাহাড়তলার দই।

অমল: এ আমি কী দেখছি, কী শুনছি, সব কেমন অচেনা লাগছে, এ দইও তো সেই দই নেই (একটু দই মুখে দিয়ে) ছি কি বিদঘুটে স্বাদ, সব কেমন হারিয়ে যাচ্ছে, সব পাল্টে যাচ্ছে এখন মনে হচ্ছে আমি এই ভালো, আমার চাই না পাঁচমুড়া পাহাড়, শ্যামলী নদী, আঁকাবাঁকা পথ, রাখাল ছেলে, চাই না কিছু না, আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে।

[অমল ঘুমিয়ে পড়ে, অমল স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, চারিদিকে তারা নেমে আসে, নাচের মেয়েরা রঙীন কাপড় নিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে যায়, একটা স্বপ্নের মত মনে হয়,দুই দিক থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাগজের নৌকা নিয়ে অমলের সামনের দিকে আসতে থাকে, অমল ও একটা বড় নৌকা নিয়ে নিজের জায়গায় চলে যায় অন্যদিকে সুধা ফুলের ডাল নিয়ে প্রবেশ করে, সে ফ্রক পরা। তার পায়ে মল বাঁধা।]

অমল: ও সুধা দিদি এত মল ঝম ঝম করতে করতে যাচ্ছ কোথায়? কোথাও যাবে বুঝি?

সুধা: নাগো আমাকে টিভিতে দেখাচ্ছে। আমি ওই জিরোগণ্ডা সানিধাপায় গাইবার সুযোগ পেয়েছি না।

অমল: সেটা কী জিনিস?

সুধা: ওমা তুমি সেটাও জানো না, সেটা বিরাট বড় গানের আসর, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই গাইতে আসবে, আমিও সেখানে যাব।

অমল: তাহলে তো দারুণ মজা হবে, সুধাদিদি আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবে। আমিও অনেক গান শিখেছি।

সুধা: দূর পাগল সেখানে তুই কী করে যাবি, আর তাছাড়া এই পোশাকে?

অমল: কেন এই পোশাক খারাপ কী?

সুধা: খারাপ নয় আবার ভালোও নয়, ওখানে যাওয়ার জন্য একটু অন্যরকমের পোশাকের দরকার হয়, তুই বুঝবিনা, আমি যাই অমল, আমি এখনও প্রথমে যে গান গাইব সেই গানটাই ঠিক করি নি। মা শুনলে ভীষণ বকাবকি করবেন, বাবা বলেছেন একটা দারুণ জামা নিয়ে আসবেন আমার জন্য, সেটা পরে আমাকে একদম টিভির মেয়েদের মত লাগবে, তুই আমাকে চিনতেই পারবি না, আমি যাই অমল।

অমল: সুধাদিদি খুব ভালো গায়, গলাটাও খুব মিষ্টি, আমাদের এখানে জন্মাষ্টমীর সময় মন্দিরের সামনে খুব বড় কীর্তনের আসর বসে, রাধাবিরহের গানগুলো তো সুধাদিদি গায়, সুধাদিদি ঠিক পারবে। গান গেয়ে ওই আসরে সবার মন জয় করে নেবে।

[মঞ্চের অন্যদিকে কীর্তনের আসর বসে, 'রাই জাগো রাই জাগো' গানটি হয়, খোল করতাল সহকারে কীর্তন হতে থাকে, অমলও কীর্তনে যোগ দেয়, অন্যদিক থেকে সুধা ফুলের মালা নিয়ে ঢোকে, আস্তে আস্তে এসে অমলের গলায় পরিয়ে দেয়, দু'জনেই হাত ধরে গানটা গাইতে থাকে গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজনকে পিছনের রস্ট্রাম দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়, চিৎকার, হল্লা, শোনা যায়, মাঝখান থেকে ফকির বেরিয়ে আসে, অমল তাকে জিজ্ঞেস করে...]

অমল: কী হয়েছে? তোমরা এত জোরে ছোটাছুটি করছ কেন?

ফকির: আরে আমাদের সুধা মাগো।

অমল: সুধাদিদি! কী হয়েছে সুধাদিদির? বলো না ফকির, বলোনা কী হয়েছে?

ফকির: যা হবার তাই হয়েছে, ছোট্ট মেয়ে সবার ভালোবাসা নিয়ে কীর্তন গেয়ে আমাদের গাঁয়ে কী সুখেইনা ছিল, রাধার গান মানেই তো সুধা এই তো ছিল ওর পরিচয়। তা সত্যি হল না, মেয়েকে নিয়ে শহরে গান গাওয়াতে নিয়ে গেল।

অমল: হ্যাঁ হ্যাঁ সুধাদিদি তো গান গাইতে গিয়েছিল, আমাকে বলেছিল এমন পোশাক পরবে যে কেউ তাকে চিনতে পারবে না, গান গেয়ে সবার মন জয় করে নেবে।

ফকির: মন আর জয় করল কোথায়, মন ভেঙে অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে মেয়েটা, বিচারকদের গান নাকি ভালো লাগেনি। তাই দিয়েছে দু কথা শুনিয়ে, ব্যস সরল মেয়ে সুধা ওখান থেকে সবার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বুড়ো শিবতলার মাঠে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আরে বাবা সুরকে কী কখনো বিক্রী করা যায়, না সুর বিক্রী হয়, সুর তো মিশবে মনের সঙ্গে মনে, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের। যে মেয়ের গান গাঁয়ের বুড়ীদের চোখে জল এনে দিত, তার গান নাকি ভালো লাগল না, হুঁ।

অমল: সুধাদিদি এখন কোথায়?

ফকির: ওই তো টনক নড়েছে ওর বাপের। ছোটাছুটি করতে শুরু করেছে, গ্রামের কবিরাজ বলল এখানে হবে না, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, লাভের লোভই এবার লোকসানে গিয়ে দাঁড়াবে। আমি তো ভাবছি সুধামায়ের কথা, ওর কী এগুলো সইবে, খুব কষ্ট হবে মেয়েটার।

অমল: ফকির আমার খুব শরীর খারাপ করছে। চোখের ওপর থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একটা কালো ছায়া সবসময় আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। একেবারেই চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে, কথা বলতে আর ইচ্ছে করছে না।

ফকির: (অমলকে বাতাস করতে করতে) অমল সব ঠিক হয়ে যাবে, তুমি একটু শান্ত হও বাবা, একটু শান্ত হও বাবা, একটু শান্ত হও। এখানে একটু শুয়ে পড় দেখি, কিছু হবে না তোমার।

অমল: সুধাদিদিও কী আর আসবে না?

ফকির: আসবে সবাই আসবে তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো, নাহলে আরো শরীর খারাপ করবে তোমার।

[পিছনের সিলুয়েডে দেখা যায় কিছু লোক মাটি খুঁড়ছে, পেছনে রাখা ডাকঘরটিকে তারা তুলে ফেলে দেয়, তার জায়গায় বিদ্যুতের তার পোঁতার চেষ্টা করে, ফকির অমল চেয়ে থাকে...]

অমল: ও কীসের আওয়াজ?

ফকির: ও কিছু না, তুমি একটু শান্ত হয়ে ঘুমও দেখি।

অমল: বল না ফকির, ও কীসের আওয়াজ, ওখানে তো সেই রাজার ডাকঘর ছিল ওখানে ওরা কী করছে, জান ফকির প্রহরী বলেছিল যে ওখানে আমার জন্যে চিঠি আসবে, রাজা চিঠি লিখবেন, আমাকে চিঠি লিখবেন।

ফকির: কোন রাজা, কোন চিঠি, সেই রাজা তো নেই অমল, সেই চিঠিও আর নেই রাজার তো এখন আর চিঠি লেখার সময় নেই, রাজা এখন বিদেশভুঁইয়ে সফরে খুব ব্যস্ত, আমাদের দিকে তাকাবার তাঁর আর সময় নেই, হ্যাঁ তুমি যদি চাও রাজা তোমাকে এস.এম.এস. করতে পারেন।

অমল: এস.এম.এস. সেটা কী?

ফকির: ওই গুরুজনদের প্রণাম যেমন এখন ওই হাঁটুতে এসে ঠেকেছে সেইরকমই চিঠিও এখন এস.এম.এস.-এ এসে ঠেকেছে। সেইজন্যই তো ওই ডাকঘর তুলে দেওয়া হচ্ছে, আর প্রহরীও এখন শহরে বড় কোম্পানীতে চাকরি পেয়ে গেছে।

অমল: তাহলে আমি আর ঢং ঢং ঢং ঘন্টা শুনতে পাব না, রাজার চিঠিও পাবনা।

ফকির: (দর্শকের দিকে তাকিয়ে) ও জানেই না ওর অজান্তে চারপাশটা কত বদলে গেছে, ওর ভালো লাগার জিনিসগুলো সব শেষ হয়ে গেছে, ওর ডাকঘরের জায়গায় স্থান পেয়েছে (আবার আওয়াজ হতে থাকে, ছায়াতে দুটো লোক খুঁটি পুতছে।)

অমল: যাও চলে যাও ফকির, কাউকে প্রয়োজন নেই আমার, কাউকে না, আমি একদম সুস্থ হতে চাই না, আমি বাইরেও যেতে চাই না। আমি আমার স্বপ্ন নিয়ে এই ভালো আছি, আমার দরকার নেই বাইরেকে জানার, সবাই পাল্টে গেছে, সবাই। কেউ নেই আমার, কেউ নেই।

[কাঁদতে কাঁদতে আরও অসুস্থ হয়ে যায়, ফকির জোরে জোরে হাওয়া করতে থাকে; এই সময় বাইরের দরজায় আওয়াজ হয়, ফকির ছুটে যায় ডাক্তারকে নিয়ে ঢোকে।]

ফকির: আসুন আসুন, একবার অমলকে দেখুন আপনি। ও আরও অসুস্থ হয়ে উঠেছে, যা মুখে আসছে তাই বলছে, অমল এই যে ডাক্তারবাবু চলে এসেছে।

ডাক্তার: একি চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ। দরজা জানলাগুলো খুলে দিন। এরকম দম বন্ধ অবস্থায় থাকে কেউ! যান যান খুলে দিন (ডাক্তার অমলকে দেখে) আলোগুলো জ্বালিয়ে

দিন। (ফকির ভেতরে যায় প্রদীপ নিয়ে আসে)

ফকির: হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়, আসলে এরকম ও ছিলো না, এ কয়দিন থেকে ওর ওই সব কথা, আমি সুস্থ হব না, আমি এই অন্ধকার ঘরেই থাকব। আমার সবকিছু পাল্টে যাচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ডাক্তার কাকা।

ডাক্তার: (নাড়ী দেখে) হুঁ যা বুঝলাম ওর ইনফেক্শন হয়েছে।

ফকির: ইনফেক্শন?

ডাক্তার: চারিপাশের বিষাক্ত জিনিসের ছোবল ওকে লেগেছে, এবং সেই ছোবলটা আঘাত করেছে ওর সুন্দর স্বপ্নগুলোকে। ওর আসল সত্যটাকে, যেটা ও মেনে নিতে পারছে না।

ফকির: বিষাক্ত জিনিস, আসল সত্য, আপনি যে কী সব বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার: আসলে অমল খুব ভালো মনের ছেলে। যার চোখে এখনও স্বপ্ন আসে, সে এখনও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, সে মিশতে চায় রৌদ্রের সঙ্গে, সে কথা বলতে চায় ঘাসের সঙ্গে, মিশে যেতে চায় শ্যামলী নদীর সঙ্গে কিন্তু ওতো জানে না শ্যমলী নদীতে বাঁধ পড়েছে। অমলকান্তি রাও এখন রোদ্দুর হতে না চেয়ে ইঞ্জিনিয়র হতে চায়। আর এই পরিবর্তনটা ও ঠিক মেনে নিতে পারছে না।

অমল: আমার সুধাদিদি কী আর আসবে না। আমাকে কী আর গান শোনাবে না?

ডাক্তার: আসবে সুধাদিদি আসবে। ঠিক আসবে অমল, তোমাকে গান শোনাবে, আমাদের গান শোনাবে।

ফকির: আসবে, ঠিক আসবে, সুধা ঠিক আসবে, আর সুধাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তারাও কষ্ট পাবে।

অমল: না না, কেষ্ট কউ পাবে না, কেউ অসুস্থ হবে না, সবাই সুস্থ থাকবে, কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করবে না। সবাই ভালো থাকবে।

[এই সময় দইওয়ালা একটা বড় হাঁড়ি নিয়ে ঢোকে ছুটতে ছুটতে]

দইওয়ালা: অমল এই দেখ, তোমার জন্য সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় ভালো দই নিয়ে এসেছি। (দই দিতে গিয়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে যায়)

অমল: তুমি এসেছ দইওয়ালা, এসো আমার পাশে এসে বসো, ফকির আমার কাছে এসো। আমার খুব শরীর খারাপ করছে। ডাক্তার কাকু আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা কেন? সব অন্ধকার হয়ে আসছে কেন, ফকির আমাকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ দেখাবে না? শ্যামলী নদী দেখাবে না? আমি সব দেখতে চাই, সবাইকে দেখতে চাই, সবাইকে কাছে পেতে চাই।

ফকির: নিশ্চয় দেখবে, নিশ্চয় তুমি একটু সুস্থ হয়ে যাও। তারপর তোমায় নিয়ে যাব, নিশ্চয় নিয়ে যাব।

অমল: ফকির আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সব অন্ধকার হয়ে আসছে (একটা কাতরভাব অমলের মধ্যে ফুটে ওঠে) সবাই অমলকে ধরে থাকে, সকলের চোখে মুখেই একটা অস্থিরভাব)

ডাক্তার: আর সময় নেই, প্রদীপের আলোটাকে কমিয়ে দিন। এখন এই ঘরের জানালা দিয়ে আকাশের তারা থেকে আলো আসুক।

[কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা, ফকির প্রদীপের আলো নেভাতে যায়, এমন সময় টুকাই টাট্টুঘোড়ায় চেপে মঞ্চের একেবারে মাঝখানে প্রবেশ করে।]

টুকাই: না ঐ আলো নিভবে না।

ফকির: নিভবে না?

টুকাই: না, অমল আলো কখনো নিভতে পারে না। অমলই তো আমাদের শিখিয়েছে আমাদের নিজেদের সুরের কথা, নিজেদের গানের কথা, আমাদের কথা, ওই আলো কখনো নিভবে না। যতই অন্ধকার হয়ে উঠুক চারিদিক ওই আলো জ্বলবেই জ্বলবে। (ছুটে অমলের কাছে যায়) চল অমল আর দেরী করিস না। আমরা দু'জনে ক্রৌঞ্চদ্বীপে পালিয়ে যাই, যেখানে আমাদের কেউ নাগাল পাবে না,আর আমাকেও অঙ্ক করতে হবে না। চল (অমল টুকাইএর হাত ধরে, সামনের পাটাতনে রাখা ঘোড়ায় চেপে বসে) আর দেখবি আমাদের সঙ্গে কারা আছে। ঐ দেখ (পিছনে অনেক ছেলেমেয়ে হাত নাড়াতে থাকে। সুধা এসে সবাইকে ফুল ছিটিয়ে দেয়, আবীর উড়তে থাকে, পর্দা বন্ধ হয়)

ইতিহাস, ঐতিহাসিক ও প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা

অচিন্ত্য মণ্ডল

অনেকেই ভেবে থাকেন 'ইতিহাস' হল অতীতের পুনরুদ্ধার। এই ধারণা নিতান্তই আংশিক সত্যি। অতীতের যে কোনও কিছু পুনরুদ্ধারই ইতিহাস নয়, তেমনই আবার যে কোনও অতীতের পুনরুদ্ধারও ইতিহাস নয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি নিঃসন্দেহে বহু লক্ষ বছরের অতীত। কিন্তু এই অতীত ইতিহাসের বিষয় বস্তু নয়। তবুও এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই সত্যি যে, ইতিহাস অতীত নিয়েই কাজ করে, অতীতকেই ব্যাখ্যা করে। এবং অতীতকে ব্যাখ্যা করে বলেই তা ইতিহাস।

প্রশ্ন হল, অতীতের সেই গণ্ডিটা কত দূর? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পৃথিবীর জন্ম, আদিম মানুষের আবির্ভাব, সভ্য সামাজিক মানুষের আবির্ভাব, সভ্যতার আবির্ভাব এসব কিছুর অতীত এক নয়। বরং প্রত্যেকটি অতীতের মধ্যে রয়েছে একটি সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান। ঐতিহাসিক কোন জায়গা থেকে শুরু করবেন? কোথায় গিয়েই বা থামবেন? কারণ আজকের দিনটা আগামী কালই তো গতকাল হয়ে যাবে। সেও এক অতীত। এক সাম্প্রতিক অতীত। ঐতিহাসিক কোন অতীতকে কে ধরবেন?

মার্ক ব্লখ (Marc Bloch) বলেছেন, ইতিহাস হল 'Science of men in time'। ইতিহাস আসলে মানুষের অতীত ব্যাখ্যা করে। যদি তাই হয়, তা হলে ইতিহাসের অতীত কিন্তু খুব বেশি আগের নয়। কারণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রেক্ষিতে মানুষের আবির্ভাব কাল নেহাৎই অল্প দিনের। কিন্তু ইতিহাস আবার এই নব্য আবির্ভূত মানুষেরও অতীত নয়, বরং সামাজিক মানুষের অতীত। অমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, 'ইতিহাস দেশ কাল, মানুষের কাহিনী।' এই যে মানুষ— সে মানুষ একক নয়— বরং সামাজিক মানুষ। সমাজে যে মানুষ একলা— ইতিহাসে তার স্থান নেই। তার স্থান সাহিত্য কবিতা, গল্প-গানে...। অশীন দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথের গানের একটি লাইন উল্লেখ করে ভারী সুন্দরভাবে বলেছেন, 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ কুসুম চয়নে'— এই একলা মানুষটির কোনও ইতিহাস নেই। এই একলা বিরহী মানুষকে নিয়ে সাহিত্য হতে পারে, ইতিহাস হতে পারে না। হতে পারে না সে বিরহী বলে নয়, একা বলে। একক মানুষের অস্তিত্ব আছে, ইতিহাস নেই।

আবার আরও এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা পরম ব্রহ্মত্ব (!) লাভের আশায় সমাজ সংসার ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে গুহা কন্দরে সাধনা করেছেন; এঁরা পরম ব্রহ্মত্ব জাতীয় কিছু পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু ইতিহাস এঁদেরকে ধরতে পারেনি। এই বিশেষ মানুষের কোনও ইতিহাস নেই। সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করেছিলেন বলেই তিনি ইতিহাসে স্থান পাননি, বরং তিনি নিজের মোক্ষ উপেক্ষা করে অন্যের মুক্তির জন্য সংসারে ফিরেছিলেন বলেই তিনি ইতিহাসের বুদ্ধ। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন ধর্মের ইতিহাস আছে, ঈশ্বরের ইতিহাস নেই।

ইতিহাস তাই সভ্য সামাজিক মানুষের অতীত বিশ্লেষণ। এখান থেকেই শুরু। আর আজকের দিনটি গতকাল হয়ে গেলে যে সাম্প্রতিক অতীতের সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক সেখানেও নির্দ্বিধায় বিচরণ করতে পারেন। এই ইতিহাস তখন হবে সাম্প্রতিক ইতিহাস— আধুনিক ইতিহাসের চেয়েও যা নবীন।

ইতিহাসের সঙ্গে ঐতিহাসিকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি বাঁচে না। ঐতিহাসিক বর্তমান কালের অংশ, আর তথ্যগুলো অতীতের। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য— দু'-এরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক নিরুপায়; আর ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যরা মৃত এবং অর্থহীন। ই এইচ কার বলেছেন, ইতিহাসের প্রথম শর্ত হল এটি ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।

সাধারণভাবে, এবং সাধারণ বুদ্ধিতে ইতিহাস বলতে বোঝায় বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি যা লিখেছেন। উনিশ শতকের উদারনৈতিক ঐতিহাসিকরা সাধারণত এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ ভাবেন, ইতিহাস হল রাজা-রাজড়ার অতীত কাহিনী ব্যাখ্যান। এসব ধারণা যেমন অপর্যাপ্ত তেমনই সরলীকৃত। আমরা ধীরে ধীরে সে আলোচনায় ঢুকব।

ইতিহাস বিভাগ

ঐতিহাসিকের কাজ কি শুধু অতীত থেকে তথ্য খুঁজে আনা, তারপর পর পর সাজিয়ে গড়ে তোলা ঐতিহাসিক সৌধ? প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। ১৮৯০-এর দশকে লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কে (L F Ranke) মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হল 'আসলে কী ছিল তা দেখানো'— অনেকটা গ্রাডগ্রিন্ড-এর উপন্যাস (Hard Times)-এ গ্র্যাডগ্রিন্ড যেমন বলেছিলেন, 'আমি যা চাই তা হল তথ্য... জীবনে শুধু তথ্যই চাই'— তার সঙ্গে সমবেত এই সুর। র‍্যাঙ্কে যা বলেছিলেন তার মূল কথা হল অভিলেখগারে যাও, সব প্রোসিডিংস, কনসালটেশানস্ পড়ো তার পর তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে একটা সৌধ খাড়া কর। তথ্যই কথা বলবে। র‍্যাঙ্কে ভক্তি ভরে বিশ্বাস করতেন, ঐতিহাসিক তথ্যের দায় নিলে ইতিহাসের তাৎপর্যের দায় নেবেন দৈব শক্তি।

বিশ শতকের গোড়ায় র‍্যাঙ্কের পজিটিভিজম ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকায় খুবই প্রভাবশালী ছিল। ফ্রান্সে ল্যাংলোয়া ও সিনোবো ছিলেন এর প্রবক্তা। ১৮৯৮-এ তাঁদের প্রকাশিত ঐতিহাসিক আলোচনার ভূমিকা (Introduction aux etudes historiques) গ্রন্থে তাঁদের মত বিশ্লেষিত করেছিল। এঁরা বিশ্বাস করতেন আঙ্গিকের দিক থেকে ইতিহাস হল স্বয়ং সম্পূর্ণ— ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি থেকে তার শেখবার বিশেষ কিছুই নেই। প্রতিটি ঐতিহাসিক একটি বিষয় বেছে নেবেন, তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে তৈরি করবেন ঘটনার কালানুক্রমিক সৌধ। ফরাসী ঐতিহাসিক ফুস্তেল দ্য কুলাজঁ ঘোষণা করেছিলেন— "History is written through the use of texts." পুরনো দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদির বাইরে কদাপি পা ফেলবে না, সিদ্ধান্তের জন্য মাথা ঘামিও না। ফ্যাক্টই কথা বলবে।

তার মানে ইতিহাস কি শুধু দলিল সর্বস্ব? অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন, দলিল সর্বস্ব ইতিহাস কাম্য নয়। 'The soil is as important as the seed', ভিন্ন যুগের মানুষ অন্য জগতের কথা শুনিয়েছেন তাঁদের রচিত দলিলপত্রে। দলিল হল অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কথোপকথন। আর অতীত হল 'লাজুক কুমারী মেয়ের মতো, প্রথম স্পর্শেই সে লুটিয়ে পড়বে না। ঐতিহাসিকের কাজ নিছক রোমন্থন নয়। ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলবেন, বিশ্লেষণ করবেন, বর্তমানের জন্য প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবী কালের ইঙ্গিতও তিনি খুঁজবেন।'

Carlo Ginzburg ইতিহাসবিদ ও আইনজীবীর মধ্যে এক মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, ঐতিহাসিক হলেন আসলেই একজন উকিল, যে মামলা লড়ে, আবার একই সঙ্গে নিজের মত প্রকাশ করে, আর মধ্যে মধ্যে পাঠকদের জুরির আসনে বসিয়ে দেয়। ঐতিহাসিক অতীতের থেকে তার তথ্য যোগাড় করেন, তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে— যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে পরম্পরা নির্মাণ করেন— সওয়াল লড়েন। এই যদি ঐতিহাসিকের ছবি হয়, তা হলে র‍্যাঙ্কের বিরোধিতা করতেই হয়, র‍্যাঙ্কে বলেছিলেন, আসলে কি ছিল তা দেখানোই ঐতিহাসিকের কাজ। অর্থাৎ, তথ্য বিশ্লেষণের দায় তার নেই। এ মানা যায় না। ঐতিহাসিক ধুলো কাদা ঝুলি মেখে যে তথ্য খোঁজেন তার সবই তিনি উপস্থাপনার যোগ্য মনে করেন না। যা কিছু তাঁর কাছে উপস্থাপনার যোগ্য সেটুকুই তিনি পাঠকের দরবারে হাজির করেন। সেটাই হাজির করেন— যা তিনি হাজির করতে চান। এই চাওয়া না চাওয়ার পিছনে কিছু যুক্তি কাজ করে, ঐতিহাসিকের মনন-মানসিকতা কাজ করে। এই মানসিকতা কোনও অখণ্ড মানসিকতা নয়, এবং সে জন্যই একটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রকম ইতিহাস ব্যাখ্যা একই সঙ্গে সত্যি হতে পারে। যাই হোক, ঐতিহাসিক আসলে অসংখ্য তথ্যের ভিতর থেকে অল্প সংখ্যক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করে তাকে ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত করেন এবং প্রচুর তাৎপর্যহীন তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে বাদ দেন। এ দুই দায়িত্ব-ই তাঁর।

ফলে ঐতিহাসিকের মনোভূমি ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। 'Historical facts are, in essence psychological facts.' অসংখ্য তথ্যের ভিতর থেকে ঐতিহাসিক কিছু তথ্যকে অর্থবহ বলে নির্বাচন করেন। তাঁর এই নির্বাচনের পিছনে সর্বকালের সর্বজনগ্রাহ্য কোনও বৈজ্ঞানিক নিয়ম কাজ নাও করতে পারে। Historian's Present সব সময় Historian Past -কে নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে শুধু (Present) নয়, এর মধ্যে ভবিষ্যতেরও স্থান আছে।

অধ্যাপক বাটারফিল্ড (H Butterfield) তাঁর Whig Interpretation of History (ইতিহাসের হুইগভাষ্য) গ্রন্থেও প্রায় একই কথা বলেছিলেন। 'অতীতের বিবর্তমান ব্যাখ্যাও ইতিহাসের এক অবধারিত কাজ। কোনও স্থির তথা অপরিবর্তনীয়ের নিরিখেই পরিবর্তনকে বিচার করতে হবে— এই প্রথাগত পূর্ব ধারণা ঐতিহাসিকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না।' 'পরিবর্তনই', অধ্যাপক বাটারফিল্ড বলেছিলেন, ঐতিহাসিকের কাছে একমাত্র ধ্রুবক। ইতিহাসের ধ্রুবক নয় অতীতের কোনও কিছু, যা থেকে আমরা শুরু করতে পারি; এটি বর্তমানের কিছু নয়, কারণ সমস্ত বর্তমান চিন্তাই অবধারিতভাবে আপেক্ষিক। এ হল এমন কিছু যা এখনও অপূর্ণ এবং হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াতেই রয়েছে। এটি নিহিত আছে ভবিষ্যতে; তার দিকে আমরা এগিয়ে চলি, এটিও তেমনি রূপ পেতে শুরু করে, আর তার আলোতেই এগিয়ে যেতে যেতে আমরা ক্রমশ গড়ে তুলি আমাদের অতীতের ব্যাখ্যান। খোদ প্রক্রিয়াটি তাই চলিষ্ণু থেকে যায়। আমরা যতই এগিয়ে চলি, আমাদের অভিমুখ বোধ ও অতীত ব্যাখ্যান নিরন্তর পরিমার্জিত ও বিবর্তিত হয়ে চলে। আজকের দিনের কোনও ঐতিহাসিকই তাই 'চূড়ান্ত ইতিহাসের' ভবিতব্য নিয়ে অ্যাক্টন-এর প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি করেন

না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, কোনও কোনও ঐতিহাসিক এমন ইতিহাস লেখেন যা অন্যদের চেয়ে আরও দীর্ঘস্থায়ী, এবং চূড়ান্ত ও বিষয়নিষ্ট চরিত্র আরও বেশি; আর এঁরাই সেই ঐতিহাসিক যাঁদের অতীত তথা ভবিষ্যৎ বিষয়ে সুদূর দৃষ্টি আছে— এমন বলা যায়। ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করার দিকে এগোলে তবেই অতীত বিষয়ক ঐতিহাসিক পারবেন বিষয়নিষ্ঠার দিকে এগোতে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক E H Carr একদা ইতিহাস বিষয়ক এক ভাষণে বলেছিলেন এ হল অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সংলাপ কিন্তু পরে তিনিও তাঁর চিন্তাকে পরিশীলিত করে বলেন, এ হল অতীতের ঘটনাবলী ও ক্রম প্রকাশ্য ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের মধ্যে সংলাপ।

ঐতিহাসিক সেই অর্থে দার্শনিকও বটে— যার দূরদৃষ্টি আছে, সেই দূরদৃষ্টি কোনও ধর্মনৈতিক দূরদৃষ্টি নয়— রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রজ্ঞা— যিনি বলতে পারেন 'আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসে আমার কবিতা খানি কৌতূহল ভরে'। আজও বোধ হয় আমাদের জীবনের এমন কোনও অভিজ্ঞতা-অনুভূতি নেই, রবীন্দ্রনাথ যেখানে প্রবেশ করতে পারেননি কিম্বা প্রবেশ করতে ব্যর্থ।

ইতিহাসে ভাষারও গুরুত্ব আছে। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। একই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন Subaltern Studies বা নিম্নবর্গীয় ইতিহাস-এর রচয়িতা শাহিদ আমিন-ও ('সাক্ষ্য প্রমাণ ভাষা ও ইতিহাস, ঐতিহাসিক, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১)। ত্রিপাঠী বলছেন, বিভিন্ন যুগে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার। Feudalim ও Capitalism-এর অর্থ বদলেছে। প্রথম দিকে এগুলি ছিল আইনের পরিভাষা--- এখন তা শুধু সামাজিক কাঠামো নয়, একটা mentalité যাঁরা সত্যজিৎ রায়-এর 'জলসাঘর' দেখেছেন তাঁরা দেখবেন কী মুন্সিয়ানার সঙ্গে তিনি সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতাকে (mentalité) চলচ্চিত্রায়িত করেছেন, কী দারুণভাবে তিনি সামন্ততন্ত্রের অবসান পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাব পর্বের বিরোধকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিশ শতকের আদিতে র‍্যাঙ্কের পজিটিভিজম (Positivism) ছিল বেদবাক্যের মত অমোঘ। র‍্যাঙ্কের কাছে Text-ই ছিল সব। ঐতিহাসিককে বিশ্লেষণের দায় থেকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন। র‍্যাঙ্কে প্রমুখদের চিন্তার এই দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রবল সোচ্চার হয়েছিলেন আঁরি বের। বেরের চারপাশে এসে জড়ো হয়েছিলেন একদল উৎসাহী ঐতিহাসিক— আঁরি হিসার, ফ্রাঁসোয়া সিমিয়াদ, লুসিয়েন ফেভর এবং মার্ক ব্লখ। এঁরা জোর দিলেন ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, মনস্তত্ত্ব-এ। ১৯৩৩-এ কুলাঁজ-এর প্রতিবাদে ফেভর বললেন, "Texts certainly, but all kinds of texts... And not texts alone." ফেভর ও ব্লখ শুরু করলেন আনাল নামে নতুন গবেষণা পত্রিকা। শুরু হল ফরাসী ইতিহাসের নয়া যুগ— আধুনিক যুগ। লেফেভর (Lefbvre) ফরাসী বিপ্লবের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে এক নতুন ধারার সূত্রপাত করেছিলেন। ভিদল লা ব্লাস (Vidal La Blache) জোর দিলেন ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর। একটা দেশের ভূমিগত পার্থক্য নদী ও পর্বতমালার অবস্থান, আবহাওয়ার পরিবর্তন নিয়ে ব্লাসের আলোচনা ব্লখ ও ফেভরকে প্রভাবিত করছিল। ব্লখ আবার এসবের ওপর প্রত্নতত্ত্ব, কৃষি অর্থনীতি, গণসঙ্গীত, সংস্কৃতি ও ভাষাতত্ত্ব— সবই দখলে এনেছিলেন। এর সঙ্গে পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয় জনসংখ্যাতত্ত্ব (demography) ও নৃতত্ত্ব। এক কথায় আনাল যা করতে চাইল তা শুধু ইতিহাস নয়, সামগ্রিক ইতিহাস— Total History ব্লখের সহকর্মী লুসিয়েঁ ফেভর চেয়েছিলেন প্রেমের ওপর, আনন্দের ওপর ইতিহাস লেখা হোক। ফলে idea, মানসিক পরিমণ্ডল বা mentalité-ও ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল অনিবার্যভাবে। এখন থেকে ইতিহাস আর ঘটনার ইতিহাস হবে না, হবে "the science of human societies"। লাদুরির The territory of the Historian গ্রন্থে জনসংখ্যা, আবহাওয়া ও মহামারীর ওপর গুরুত্ব দেখা গেল। যৌনতা কৈশোর ও মৃত্যুও এখন ইতিহাসের বিষয় হিসাবে ঢুকে পড়ল।

আমাদের দেশে পঞ্চাশের দশকের আগে যে ইতিহাস রচিত হত তা ছিল মূলত কোনও বীরের জীবনীমূলক। যেমন সুরেন্দ্রনাথ সেনের শিব ছত্রপতি; নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের 'হায়দার আলি', বেণীপ্রসাদের 'জাহাঙ্গীর', কানুনগোর 'দারাশুকো', কালি কিংকর দত্তের 'আলিবর্দী'। কেউ কেউ আবার হিন্দু প্রতিভা অন্বেষণে ব্যস্ত, যেমন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রমেশচন্দ্র মজুমদার, চিনে ও মধ্য এশিয়ায় প্রবোধ বাগচী। আর ছিল ইংরেজ ও জাতীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস। দু' একজন যদিও ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন।

এরপর শুরু হল, ধীরে ধীরে হলেও হল— অন্য ধারার ইতিহাস রচনার কাজ। অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে নানা রকম গবেষণা শুরু হল। N K Sinha-র Ecomonic History of Bengal, অমলেশ ত্রিপাঠীর Trade and Finance in Bengal Presidency অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার পথপ্রদর্শক। তপন রায়চৌধুরী করমণ্ডলে উপকূলীয় বাণিজ্য নিয়ে, অশীন দাশগুপ্ত মালাবার ও সুরাট বাণিজ্য নিয়ে, ইন্দ্রাণী রায় ফরাসী বাণিজ্য নিয়ে, সুশীল চৌধুরী প্রাক-পলাশী বাংলা নিয়ে নতুন ধরনের কাজ করলেন। চিত্তব্রত পালিত, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রকুমার, অমিয় বাগচী-র অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে বিস্তর লেখালেখি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিনয় চৌধুরীর কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি সম্পর্ক নিয়ে রচনাও

উল্লেখযোগ্য। ইরফান হাবিব মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লিখলেন। 'তলা থেকে ইতিহাস চর্চার' (History from below) প্রতি ঝোঁক দেখা গেল। সমাজ সংস্কৃতি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন ধারা কাজ শুরু হল— রজতকান্ত রায়, সুরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রকুমার প্রমুখের হাত ধরে ইতিহাসের নতুন আঙ্গিক শুরু হল। অমলেশ ত্রিপাঠী 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' নামের যে গ্রন্থ রচনা করলেন তাতে রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও অন্যান্য দার্শনিক ও মানসিক টানাপোড়েনও স্থান পেল। তিনি নিজেই বলেছেন এই গ্রন্থের রচনায় তিনি আনাল স্কুলের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সুমিত সরকার, বিপান চন্দ্র ও অন্যান্যদের রচনাতেও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি সামগ্রিকতাকে বিশ্লেষণের চেষ্টা আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য mentalité বা emotion নিয়েও ইতিহাস গ্রন্থ রচনা শুরু হল। রজতকান্ত রায়-এর Exploring Emotional History ইতিহাস রচনার গতিমুখকে অনেকটাই অগ্রবর্তী করেছে সন্দেহ নেই। এছাড়া আরও অসংখ্য ভাল ভাল কাজ ভারতীয় ইতিহাস রচনার ধারাকে নিঃসন্দেহে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে— ইতিহাস সম্পর্কিত প্রাচীন ধারণার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করেছে। Subaltern Studies-এর ইতিহাসকারেরাও ইতিহাস চর্চাকে নামিয়ে এনেছেন মাটির অনেক কাছাকাছি। ইতিহাস তাই এখন আর শুধু বীরের আখ্যান কাহিনী নয়, ইতিহাস এখন সব কিছুকেই আত্মস্থ করতে পারঙ্গম— ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, মন, মানসিকতা, আবেগ, প্রেম, যৌনতা (sexuality) সব কিছুই এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাস এখন এই বিশাল ব্যপ্তির আধার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. অশীন দাশগুপ্ত— ইতিহাস ও সাহিত্য
২. অশীন দাশগুপ্ত— ইতিহাস চর্চা, ঐতিহাসিক: আজকের দায়
৩. অশীন দাশগুপ্ত— বাঙালীর ইতিহাস সাধনা
৪. অমলেশ ত্রিপাঠী— ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
৫. অমলেশ ত্রিপাঠী— বিংশ শতাব্দীর ফরাসী ইতিহাস চর্চা ও ফেরনন্দ ব্রোদেল
৬. অমলেশ ত্রিপাঠী— স্বাধীনতার মুখ
৭. E H Carr – What is History
৮. E Sreedharan – A Text Book of Historiography 500 BC-AD 2000
৯. R G Collingwood – Idea of History
১০. Marc Bloch – The Historian's Craft
১১. Rajat Kanta Roy – Exploring Emotional History
১২. শাহিদ আমিন --- 'সাক্ষ্য, প্রমাণ, ভাষা ও ইতিহাস'; ঐতিহাসিক, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১

উন্নয়নের 'অ-রাজনৈতিক' সাম্রাজ্য বিস্তার

অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে দুটি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা আমাদের ভাবনা-চিন্তাকে প্রভাবিত করে চলেছে স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই। স্বতঃসিদ্ধ দুটি হল, দারিদ্র্য আমাদের প্রাথমিক পরিচয় আর উন্নয়ন আমাদের সবথেকে বেশী প্রয়োজন। প্রয়োজন কিসের জন্যে? দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে, উন্নত হয়ে, পৃথিবীর ধনী দেশগুলির সাথে এক পংক্তিতে বসার জন্যে, এমন এক ভবিষ্যৎ রচনা করার জন্যে যেখানে ধন-সম্পদ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পর্যাপ্তি আছে। সেই উজ্জ্বল স্বপ্নরঙিন দিনগুলিতে (যেখানে পৃথিবীর ধনী দেশগুলি ইতিপূর্বেই পৌঁছে গেছে) আমরা দরিদ্র, অনুন্নত দেশের মানুষেরাও পৌঁছাতে চাই। আমরা যেদিন থেকে কলোনির নেটিভ পরিচয় ঝেড়ে ফেললাম সেদিন থেকেই আমরা দরিদ্র, অনুন্নত, আর এই রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় হল যত দ্রুত সম্ভব, যত রকম উপায়ে সম্ভব উন্নয়ন করা। তার জন্যে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক, আর্থিক ও বৌদ্ধিক, সবরকম সাহায্য আমাদের কাজে লা'গাতে হবে। এই গোটা ছবিতে আপাতদৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই বলে মনে হতে পারে, বরং এটিই হল উন্নয়ন-ভাবনার আধিপত্যকারী ভূমিকার এক চিহ্ন। এই লেখায় আমরা এই আধিপত্যের পর্দার আড়াল থেকে একটু বেরোনোর চেষ্টা করব, যে পর্দা আমাদের মননে উন্নয়নের এহেন ধারণাকে প্রশ্নাতীত বানিয়ে রাখে। এই বাজার-চলতি উন্নয়ন-ভাবনার 'ধরে নেওয়া'-গুলি সমস্যায়নের চেষ্টাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এ লেখার কেন্দ্রবিন্দু হল উন্নয়নের জ্ঞানের সমস্যায়ন।

ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের একটি বিজ্ঞাপন ১৭ই নভেম্বর, ২০১১ তারিখে বিভিন্ন খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল, নিশ্চয়ই অনেকেরই নজরে পড়েছিল। বিজ্ঞাপন দিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিনিধি যোজনা। বিজ্ঞাপনটির শিরোনাম, ''বি দি চেঞ্জ ইউ ওয়ান্ট টু সি''। এটি গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে জেলায় জেলায় চুক্তিতে নিয়োগ করার জন্যে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, অথবা ডাক্তারিতে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, হিন্দি জানা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে 'ফাস্ট-ট্র্যাক' উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টিগ্রেটেড 'অ্যাকশন প্ল্যান' প্রয়োগের জন্যে এমন ছেলেমেয়ে খোঁজা যারা 'কথায় না বিশ্বাস করে কাজে বিশ্বাস করে'। বলা হয়েছিল, "become a flag-bearer of development where it is needed most"। মেয়েদের কাছ থেকে দরখাস্ত পাওয়ার উপরে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

এই ধরনের বিজ্ঞাপন কোন পরিস্থিতিকে এবং বিষয়কে চিহ্নিত করে তা উপরের বিজ্ঞাপনের এক নিবিড় পাঠ থেকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশ যে এক দরিদ্র এবং অনুন্নত দেশ তা বহুদিন ধরেই, অন্তত স্বাধীনতার পর থেকেই সর্বজনস্বীকৃত। সকলেই মেনে নিয়েছে যে আমরা দরিদ্র, আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সবকিছুতেই সাহায্য দরকার, উন্নত হয়ে ওঠার জন্যে। একথাও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে দেশটার সব ভালো, কেবল আর একটু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-শুদ্ধি আর জীবন-যাপন সম্পর্কে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে পারলেই একদিন 'অগ্রগতি' হবে। কলম্বিয়ান নৃতাত্ত্বিক আর্তুরো এস্কোবার তাঁর নিজের দেশের উন্নয়নের চেষ্টার সমালোচনা প্রসঙ্গে যেমন বলেছেন,

Development brings the light, that is, the possibility to meet "scientifically ascertained social requirements." The country must thus awaken from its lethargic past and follow the one way to salvation, which is undoubtedly, "an opportunity unique in its long history" (of darkness, one might add). [আর্তুরো এস্কোবার, এনকাউন্টারিং ডেভেলপমেন্ট— দি মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অফ দি থার্ড ওয়ার্ল্ড, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ২৬]

সুতরাং এই দারিদ্র্য, অনুন্নতি নামক রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে প্রয়োজন জ্ঞান, শিক্ষা, অর্থ এবং শুভবুদ্ধির বিতরণ। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচী নেওয়া, যা ভারতের মত সব তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রই নিয়মিতভাবে নিয়ে চলেছে, তাদের কলোনি থেকে

অর্থনীতি বিভাগ

পোস্ট-কলোনি হয়ে ওঠার পর থেকেই। ভারতে কখনও দেখা যায় 'ভারত নির্মাণ', 'সর্বশিক্ষা অভিযান', 'জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন', 'জাতীয় সামাজিক সাহায্য মিশন', 'জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা প্রতিশ্রুতি আইন', আবার কখনও দেখা যায় 'শিশু অপুষ্টির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ'। আর এই সমস্ত যোজনা ও মিশনের জন্যে চাই উৎসাহী, সদিচ্ছা-সম্পন্ন মানুষ (কম বয়সী ছেলেমেয়েরা হলে আরো ভালো, তাদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে কম টাকার কাজের আগ্রহ এই ধরণের কাজে জরুরী), যাঁরা বেশী ভাবনা-চিন্তা করতে গিয়ে দেরী না করে ফেলে, কাজের কাজটুকু করবেন।

এ ধরনের বিজ্ঞাপন, উদ্যোগ, ভাষা বা তার পিছনের ভাবনা কোনোটাই তেমন নতুন কিছু নয়। বরং এ ধরনের হাজারো যোজনার তালিকায় এটি একটি সংযোজন মাত্র। এইসব উন্নয়নমূলক উদ্যোগ এক বিশেষ জ্ঞান ও রাজনীতিকে চিহ্নিত করে। সবথেকে বেশী নজর টানে এক অদ্ভুত রূপকের ব্যবহার, যা আপাতদৃষ্টিতে মহামারী প্রতিরোধের। অনুন্নতি, দারিদ্র্য হল সংক্রামক রোগের মহামারী, আর তার হাত থেকে রোগগ্রস্ত মানুষদের রক্ষা করার জন্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাই দরকার ফাস্ট-ট্র্যাক উন্নয়নের অ্যাকশন প্ল্যান। এ হল এক অত্যন্ত জরুরী অবস্থা, বেশী চিন্তা-ভাবনা করতে গেলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যাবে। সুতরাং কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হতে হবে। অর্থাৎ কথা (মানে চিন্তা-ভাবনা আর কি) আর কাজের মধ্যে বৈরিতা আছে, অর্থনীতির পরিভাষায় এদের মধ্যে ট্রেড-অফ রয়েছে, একটি হলে অন্যটির বদলেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর গ্রামোন্নয়ন যোজনায় দরখাস্তকারীর বয়স তিরিশের উপরে হতে পারবে না কেন? আজকালকার কম বয়েসীরা ভাবেন কম, ভালো মাইনে দিলে আর নিজেদের সিভি-তে উল্লেখ করার সুযোগ পেলেই নিয়ম পালন করবেন বেশী এটা ধরে নেওয়া হল কি? এই ধরে নেওয়া ঠিক কি বেঠিক সে বিতর্ক আপাতত অন্য সময়ের জন্যে তোলা রেখে, এহেন গরিবি (রোগ) - সারানোর প্রেসক্রিপশনের সংস্কৃতির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ভেবে দেখা জরুরি। এই ধরনের উদ্যোগের মধ্যে কোথাও দারিদ্র্য বা অনুন্নতির 'হয়ে ওঠা'-র ইতিহাসের অথবা তার রাজনীতির কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। এবং এর পিছনের চিন্তা-ভাবনার প্রস্থানবিন্দুই হল দারিদ্র্য বা অনুন্নতি, যা এক কথায় গিভেন। অর্থাৎ দরিদ্র, অনুন্নত মানুষেরা ইতিহাসের শুরু থেকেই দরিদ্র এবং অনুন্নত, এখন কাজ শুধু তাদের দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার জন্যে উন্নয়ন করে চলা। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমস্যাটি জানা হয়ে গেছে, চাই কেবল সমাধান। উন্নয়ন-ভাবনার এই অনৈতিহাসিকতা পথ করে দেয় সমাধান উৎপাদনের ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হওয়ার, যেখানে দরিদ্র, অনুন্নত মানুষেরা ম্যানেজমেন্টের বিষয়বস্তু। একদিকে ইতিপূর্বেই জেনে যাওয়া সমস্যার বর্গীকরণ, তালিকাভুক্তিকরণ আর নিত্য নতুন নামকরণ চলতে থাকে, অন্যদিকে সমাধানের জন্যে নানান যোজনা, নীতি, স্কিম, অ্যাকশন প্ল্যান ইত্যাদির তালিকা আর তার জন্যে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বাড়ে না কেবল দারিদ্র্যমুক্তি, অনুন্নতির হাত থেকে রেহাই। ঋণের ভারে ন্যুব্জ কৃষকেরা কোথাও দলে দলে আত্মহত্যা করেন, কোথাও গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি দেন বস্তির অকিঞ্চিৎকর জীবনযাপনে নিজেকে উৎসর্গ করবেন বলে, কোথাও আজ বিপিএল কার্ডের জন্যে ভিক্ষে করেন তো কাল ইউনিক আইডেন্টিটি কার্ডের জন্যে হাত পাতেন, কোথাও সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীতে নাম লেখান, আবার কোথাও দেশের 'বৃহত্তর স্বার্থে' জীবন-জীবিকা-সম্মান হারিয়ে ক্ষমতাবানের পাঁচিলঘেরা জীবন-যাপনের দারোয়ান হয়ে বাঁচার মরীয়া চেষ্টা করেন।

উন্নয়নের এই সন্দর্ভে বেশ কিছু 'ধরে নেওয়া' কাজ করে চলে। সেগুলিকে একবার একত্রিত করে দেখা যাক। প্রথম, উন্নয়নের হস্তক্ষেপ সবসময়েই অতি দ্রুত হওয়া চাই, কারণ পরিস্থিতি সবসময়েই অত্যন্ত জরুরী। দ্বিতীয়, উন্নয়নের ভাবনার প্রস্থানবিন্দু হল অস্তিমান দারিদ্র্য ও অনুন্নতি, যার বিকামিং বা 'হয়ে ওঠা' ভাবনা ও প্রশ্নের অতীত। সুতরাং দারিদ্র্য ও অনুন্নতির পরিচয় কিভাবে কেন তৈরি হল আর তার পিছনে জাতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষমতার সমীকরণের ভূমিকা কী থেকেছে, সেসম্পর্কে উন্নয়নের কোনো মাথাব্যাথা নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, উন্নয়ন ভাবনা এক অনৈতিহাসিক ও অরাজনৈতিক বাস্তব গড়ে তোলে। তৃতীয়, যেহেতু উন্নয়ন ইতিপূর্বেই জেনে যাওয়া অ-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে দেবার দাবী ঘোষণা করে (সমস্যার পুনর্বর্গীকরণ, পুনর্নামকরণ চলতে থাকে নিরন্তর), আবশ্যিকভাবেই তার সমাধান (গুলি) ও অরাজনৈতিক হয়। সমস্যা দূর হয় না, হয় কেবল তার চেহারা বদল, আর তার অরাজনৈতিক সমাধানের সাম্রাজ্য ফুলে ফেঁপে ওঠে। চতুর্থ, উন্নয়নের চিন্তা ও কাজ করার ডাক দেওয়া হয় (আগে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনের মতই) এইসব রোগগ্রস্তদের দলের বাইরে থাকা মানুষদের। ধরে নেওয়া হয় যে উন্নয়ন-চিন্তা ও কাজের যোগ্যতা আছে তাঁদেরই যাঁরা দারিদ্র্য ও অনুন্নতির ভৌগোলিকতার বাইরে বাস করেন। অর্থাৎ দারিদ্র্য ও অনুন্নতির পরিচয়ের পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দরিদ্র ও অনুন্নত মানুষদের নেই। সে জ্ঞান আছে জ্ঞানবান, শিক্ষাবান, (এবং ফলস্বরূপ) ক্ষমতাবানদের কাছে, দরিদ্র-অনুন্নত মানুষেরা সে জ্ঞানের দান গ্রহণ করে তবেই রোগমুক্ত হবেন। পঞ্চম, Economics of Development অর্থাৎ উন্নয়নের অর্থনীতি দারিদ্র্য ও অনুন্নতির রোগ সারানোর একমেবাদ্বিতীয়ম মহৌষধি জানে, তার কাছে আছে 'সত্য', কারণ অর্থনীতি হল বিজ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের মনে পড়তে পারে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের আগে নিয়মিতভাবে দেখতে পাওয়া যেত দেওয়ালে দেওয়ালে সদম্ভ ঘোষণা, ''মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান কারণ ইহা বিজ্ঞান', অথবা, 'মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান

কারণ ইহা সত্য'। উন্নয়নের অর্থনীতিও এই একই বিশ্বাস প্রচার করে চলে। এর পিছনে অর্থনীতি নামক বিষয়টির রাজনৈতিক অর্থনীতি থেকে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে ঐতিহাসিক রূপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকেছে, যা উন্নয়নের অর্থনীতিকে দিয়েছে এক প্রশ্নাতীত আধিপত্য।

প্রথমে ভেবে দেখা যাক, উন্নয়ন সবসময়েই এত তাড়াহুড়ো করে করতে হয় কেন। কেন সবসময়েই বলতে হয়, 'the urgent needed of development'? যাঁরা উন্নয়ন নিয়ে যোজনা বানান, তত্ত্ব তৈরী করেন, সত্য উদ্ঘাটন করে ফেলার দাবী রাখেন, তাঁরা কেউই এই চটপট উন্নয়ন করে ফেলার প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন না। 'কোথায় যেন মানুষ কাঁদে, কোথায় যেন কাঁদছে হায়', ফলে যদিও এতে আমাদের রাতের ঘুম ছোটে না, কিন্তু উন্নয়ন করতে গিয়ে দেরি করা যাবে না একথা সবাই মেনে নেন। মানুষের ভালো এখনি করতে হবে, নাহলে সবাই দলে দলে মারা যাবে, ভাবনাটি এমনই। এর মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন ভাবনা বলে, 'একদিকে মানুষ মারা যাচ্ছে, আর তুমি ঠান্ডা ঘরে বসে বসে জল্পনা করে চলেছ, ভেবেই চলেছ?' এমন ভর্ৎসনা আমাদের সবার পরিচিত। এবং এতে আমরা নিজেদের অজান্তেই লজ্জিত হতে জেনে গেছি। সত্যিই তো, এই কি আমাদের আরাম করে বসে বসে তত্ত্ব কপচানোর সময়? এ হল মানুষকে সাহায্য করার সময়। কিন্তু প্রশ্ন হল, অসুবিধা ঠান্ডা ঘরে আরাম করে বসাতে নাকি চিন্তা-ভাবনা করাতে? প্রথমটির সাথে সাথে দ্বিতীয়টিও সমালোচনার বিষয় হয়ে গেছে। আর তার পিছনে যুক্তি হল, ভাবার সময় পরে, অর্থাৎ কাজের পরে। এখন কেবল কাজের সময়, মানে উন্নয়নের সময়। এখন 'কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড় হতে হবে', যদিও এই 'এখন' কবে শেষ হয়ে চিন্তা-ভাবনার উপযুক্ত সময় আসবে, তা বলা যায়না কখনই। কাজ আর কথা হল মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, কাজ করতে গেলে চুপচাপ কাজই করে যেতে হয়, কারণ ভাবতে গেলে কাজ হয় না। কিন্তু একদল মানুষের কর্মব্যস্ততার মাঝেই, কেউ না কেউ তো ভাবছেন নিশ্চয়ই অন্তত কীরকম করে উন্নয়ন হবে, কোথায় এবং কার হবে, কত খরচ হবে এটুকু তো ভাবছেনই। সুতরাং ব্যাপার হল, কর্মী আর ভাবিয়ে এরা একই মানুষ হওয়া চলবে না। যেমন এ লেখার প্রথমে আলোচিত সরকারি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সরকার ভাববেন, যোজনা করবেন আর যাঁদের কর্মী হিসাবে যোগ দিতে ডাকা হচ্ছে, তাঁরা চিন্তা-ভাবনাহীন হয়ে 'কথায় না বিশ্বাস করে কাজে বিশ্বাস করবেন'।

উন্নয়নের ইতিহাসের সূচনা হিসাবে ধরে নেওয়া হয় দারিদ্র্য ও অনুন্নতিকে। এই ধরে নেওয়ার যে একটি ইতিহাস আছে সেকথা আর মনে পড়ে না। কবে কীভাবে কেন পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষ হয়ে পড়লেন দরিদ্র যাদের সাহায্যের প্রয়োজন, সে বৃত্তান্ত উন্নয়নের কোন ভাষ্যেই খুঁজে পাওয়া ভার। অর্থাৎ জ্বর হলে কি কারণে জ্বর তা জানার প্রয়োজন ছাড়াই কোন দাওয়াই দিলে জ্বর সারবে কেবল তা নিয়েই আমাদের যত চিন্তা-ভাবনা। ফলে জ্বরের কারণের চিকিৎসা কখনোই হয়ে ওঠে না, আর জ্বরও সারে না। তবে জ্বর সারানোর জন্যে ডাক্তার/ কম্পাউন্ডারের দরকার হয়ে ওঠে চিরকালের ব্যাপার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, যখন একে একে ইউরোপের কলোনি দেশগুলি স্বাধীনতা পাচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক রদবদল ঘটে। সে সময় প্রথম শুনতে পাওয়া গেল এই সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার চিন্তা ও সাহায্য করার আগ্রহের কথা। এই বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কলোনির দেশগুলি ঘোষিতভাবেই ছিল প্রভু দেশগুলির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদনের কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের যোগানদার। সেসময় ইউরোপ-আমেরিকার পক্ষে এইসব রঙ্গীন চামড়ার মানুষদের দেশ নিয়ে এর বেশী কিছু ভাবার ছিল না। কলোনির দেশগুলি ছিল বন্য,অসভ্য, হোপলেস মানুষদের বাসস্থান, যাদের উন্নত করার ভাবনা প্রভু দেশের মনে ছিল না। কারণ অধীনস্থ প্রজাদের উন্নত করার কোনো প্রয়োজন তাদের ছিল না, যতক্ষণ তাদের দরকারি যোগান নির্বিঘ্ন ছিল। ফলে মোটামুটি ১৯৪৫ এর আগে উন্নয়নের অর্থনীতি একপ্রকার অনাবিষ্কৃতই ছিল। গোল বাধল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন প্রজারা স্বাধীন হতে শুরু করল। নতুন গজিয়ে ওঠা একদল সার্বভৌম দেশের অস্তিত্বের কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষমতার সমীকরণ বদলাতে শুরু করল। পৃথিবী সেসময় তিন টুকরো, একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত কলোনিহারা ইউরামেরিকা, মাঝে কমিউনিস্ট রাশিয়া ও তার রাজনৈতিক অনুসারী পূর্ব ইউরোপ এবং আর একদিকে সদ্য স্বাধীন একদল দেশ। ১৯৪৫ সালে ইউনাইটেড নেশনস্ এই তিনভাগের নাম রাখল প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় বিশ্ব। আর্তুরো এস্কোবার উল্লেখ করেছেন যুদ্ধ-পরবর্তী আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে হ্যারি ট্রুম্যানের প্রথম বক্তৃতা,

More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their food is inadequate, they are victims of disease. Their economic life primitive and stagnant. Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous area. For the first time in history humanity possesses the knowledge and the skill to relieve the suffering of these people...What we envisage is a program of development based on the concepts of democratic fair dealing...Greater production is the key to prosperity and peace. And the key to greater production is a wider and more vigorous application

of modern scientific and technical knowledge. [আর্তুরো এস্কোবার, এনকাউন্টারিং ডেভেলপমেন্ট— দি মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অফ দি থার্ড ওয়ার্ল্ড, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ৩]

এই প্রথম কোনো একটি দেশের নেতা বাকি পৃথিবীর এক দৈন্য-দুর্দশা-রোগগ্রস্ত চিত্র উপস্থাপন করলেন যাদের সাহায্য করা সমৃদ্ধশালী দেশগুলির কর্তব্য। যে প্রশ্ন এখানে ওঠা অতি স্বাভাবিক হত অথচ সচারচর যাকে 'ইগনোর' মেরে দেবার চেষ্টা চলে, তা হল, যে সময় এইসব দেশগুলির যুদ্ধের ক্ষতি সামলানোর চিন্তাতেই ভারাক্রান্ত থাকার কথা ছিল, তখন তারা গরীব দেশগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে উঠতে শুরু করল কেন? নেহাতই মানবিকতার খাতিরে? তাহলে এই মানবিকতার জন্মের জন্য কলোনির যুগের অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল কেন? উন্নয়নের ইতিহাসের চর্চাকারীরা, যেমন আর্তুরো এস্কোবার, মজিদ রহনেমা, ফ্রেডরিক অ্যাপফেল-মার্গলিন প্রমুখেরা বলবেন, মানবিকতা নয়, কিছু নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই তৃতীয় বিশ্বের সার্বভৌম দেশগুলির উপকার করার, সাহায্য করার এবং তাদের পথনির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন গড়ে ওঠে প্রথম বিশ্বে। সেই কারণগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল হারিয়ে ফেলা কলোনি থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমের এতদিনের অব্যাহত যোগানের ব্যবস্থার নতুন ন্যায্যতা, প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন (কারণ এখন সম্পর্ক কতগুলি অধিকৃত ভূখন্ডের সাথে নয়, বরং কিছু স্বাধীন দেশের সাথে), আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শগত শত্রু কমিউনিস্ট দ্বিতীয় বিশ্বের সাথে রাজনৈতিক এলাকা দখলের ঠান্ডা লড়াই (cold war) এবং প্রথম বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বভূমি পুঁজিবাদের শর্ত পালনের জন্য ও বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বৃত্ত পুঁজির বিনিয়োগের জন্য ক্রমাগত নতুন নতুন বাজারের প্রসার বজায় রাখা। এই উদ্দেশ্যগুলি প্রয়োগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাতিয়ার প্রথম বিশ্বকে যুগিয়েছে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস।

পুনর্গঠনশীল ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যতই প্রসারিত হতে থাকে, তাকে বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন হয় তিনটি বিষয়ের। এক, সস্তা উৎপাদন সামগ্রী (শ্রমিক ও অন্যান্য কাঁচামাল), দুই, উৎপন্ন জিনিসপত্র বেচার জন্য বাজার, আর তিন, জমতে থাকা বিরাট অঙ্কের পুঁজির বিনিয়োগের বাজার। বলা বাহুল্য যে এই তিনটি ক্ষেত্রেই তৃতীয় বিশ্বের উপযোগিতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। কারণ বিরাট সংখ্যায় কর্মাকাঙ্খী ও মজুরির দর-কষাকষির ক্ষমতাহীন মানুষ, খনিজ সম্পদ, জল, শিল্পভিত্তিক ব্যবহারের বাইরে পড়ে থাকা জমি ইত্যাদি কাঁচামাল দুই-ই অতুলনীয় কম মূল্যে সহজলভ্য থেকেছে তৃতীয় বিশ্বে। তেমনি অন্যদিকে, পুঁজিবাদের উপস্থিতি ক্ষীণ হবার ফলে বিবিধ বস্তু ও পরিষেবার পণ্যায়নের মাত্রা কম থেকেছে, যার ফলে বাজারের প্রসার তেমন ঘটেনি। এই কারণে পুঁজির বিনিয়োগের মরিয়া চেষ্টাও দেখা যায়নি। প্রথম বিশ্বের সামনে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের এমন সুবর্ণ সুযোগ পুঁজিবাদের ইতিহাসে এর আগে আসেনি। সদ্য স্বাধীন হওয়া এই সার্ব্বভৌম দেশগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নয়নের মতই এক অনস্বীকার্য যুক্তির। যে যুক্তি এই সব দেশগুলিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত এবং অপরিহার্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। উন্নয়নের জ্ঞানের আধিপত্যের চিহ্ন দেখা যায় স্পষ্ট, যখন একের পর এক দেশ উন্নয়নের নামে অর্থকরী সাহায্য নেওয়ার পর থেকেই সেখানকার রাজনীতি, সমাজনীতি বাজারের পশ্চিম-মুখী দরজা খুলে দিতে শুরু করে। দারিদ্র্য, অসাম্য ইত্যাদি যদিও তর্কাতীতভাবে তর্কের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে, অতীত হয়ে যায় না অথবা উন্নয়নের দাবী অনুযায়ী কমতেও থাকে না আর মানুষকে প্রত্যাশামত সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়েও দিতে পারে না, তবুও এই জ্ঞানের মান্যতা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়ে চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যেকার রাজনৈতিক রেষারেষি ভৌগোলিকভাবে তৃতীয় বিশ্বেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে শুরু করে, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের উদ্যোগ যাকে ন্যায়সঙ্গত করে তোলার জন্য দরকারি যুক্তি যোগায়। দুই যুযুধান ভাবাদর্শ পুঁজিবাদ ও মার্ক্সীয় সাম্যবাদ নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে তৃতীয় বিশ্ব তথা পূর্ব ইউরোপে ক্রমেই নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চেষ্টা করে। ১৯৪৫ সালের পর প্রথম বিশ্বে আর কোনো বড় যুদ্ধ ঘটেনি, পক্ষান্তরে তৃতীয় বিশ্বে নানা কারণে 'অনুষ্ঠিত হয়েছে' দেড়শোর বেশী যুদ্ধ, যেখানে প্রথম বিশ্বের দেশগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পক্ষ নিয়েছে, অস্ত্র বেচে অথবা সৈন্য, প্রযুক্তি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছে। আর তার ভূমিকা দীর্ঘায়িত হয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনেও থেকেছে। প্রথম বিশ্বের বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থাগুলি থেকে শুরু করে, সরকারি ও বেসরকারি (এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও) অর্থ, প্রযুক্তি ও উপদেশগত সাহায্য নানা উন্নয়নমূলক কাজের উদ্দেশ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নিয়মিত ভাবে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে মনে করা যায় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ (১৯৪৮), প্রথম ইন্দোচীনের যুদ্ধ (১৯৫৩), ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়ার যুদ্ধ (১৯৫৬-১৯৭৫), ইন্দোনেশিয়ার গণহত্যা (১৯৬৫-১৯৬৬), চিলির মিলিটারি হুনতার গণহত্যা (১৯৭৩-১৯৯০), ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমোর আক্রমণ (১৯৭৫), ইথিয়োপিয়া-সোমালিয়ার যুদ্ধ (১৯৭৭), গালফের যুদ্ধ (১৯৯১), ক্রোয়েশিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৯৯১-১৯৯৫), আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি নানা দেশ আক্রমণ, যেমন গ্রেনাডা (১৯৮৩), লিবিয়া (১৯৮৬), পানামা (১৯৮৯) ইত্যাদি।

তর্ক একসময় এই নিয়েই চলতে থাকে যে দারিদ্র্যরেখার উপরে থাকার জন্যে উপযুক্ত দৈনিক বরাদ্দ ২২০০ কিলো ক্যালোরি না ৩২ টাকার খাবার, অথবা, সর্বস্তরে চুঁইয়ে পড়ার জন্য অর্থনৈতিক গ্রোথ ৭% না ৮% হওয়া দরকার, অথবা, মোট জনসংখ্যার ৭৬% না ৬৭% দরিদ্র। উন্নয়নের এই রাশিতত্ত্বের জগৎ যত প্রসারিত হতে থাকে তত দারিদ্র্য-অনুন্নতির শিকার ঐসব মানুষদের জীবন সম্পর্কে সবকিছু জানা এবং তাদের জীবন যাপন সম্পর্কে সবরকম উপদেশ দেওয়া হয়ে ওঠে নীতিসঙ্গত। তাদের বাড়িতে এমনকি তাদের বিছানাতেও উঁকি মারতে হয়, তাদের গতিবিধি, জমি-জিরেত, খাবার-দাবার, কাচ্চা-বাচ্চা, শাড়ি-লুঙ্গি-গামছা গুনে-গেঁথে রাখতে হয় নিয়মিত। তেমনি আবার তাদের শোধরানোর জন্য চাষ-বাস, পুষ্টি, রান্না-বান্না, সন্তানধারণ (বা রোধ) ও লালন-পালন, পাল্‌স্ পোলিও ইত্যাদি নানান ধরণের আদেশ-নির্দেশ দিতে হয়। এই ধরণের হস্তক্ষেপ, আলোকপাত যে অভিভাবকত্বের, ক্ষমতার চিহ্নায়ক, তার জন্য সচরাচর কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। এই আলোকপাত আবশ্যিকভাবেই উপর থেকে নীচের দিকেই ঘটে, অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর দ্বারা নিম্নশ্রেণীর উপরেই হয়, এর অন্যথা কখনই সম্ভব নয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষকে শেখাতে হয় যে অভিভাবক শিশুর ভালো করতেই চান, যাতে শিশু বড় হয়ে অভিভাবকের মত বাড়ি-গাড়ি হাঁকিয়ে, বেশী কেনাকাটা করে, বেশী খেয়ে-পরে সুখে থাকতে পারে। ভবিষ্যতের সুখের জন্য শিশুকে অভিভাবকের নির্দেশ মতই চলতে হয়। আর অভিভাবক আন্তরিকভাবে, নিঃস্বার্থভাবে শিশুর ভালো করতে চান বলেই বারে বারে তাঁর সমাধানাবলী বদলে চলেন, যাতে শিশুর আরো অনেক ভালো হয়। যদি আদতে ভালো হওয়াটা চোখে দেখতে না পাওয়া যায়, অন্তত শিশু অভিভাবকের সদিচ্ছায় বিশ্বাস করতে শুরু করে।

দারিদ্র্য আর অনুন্নতির সমস্যার সমাধান যাঁরা তৈরী করেন, ভুক্তভোগীদের জীবনযাপন নিয়ে যোজনা বানান, শলাপরামর্শ দেন তাঁদের দলে ভুক্তভোগীরা কেউ থাকেন কি? সচরাচর না। এই লেখার প্রথমে উল্লিখিত বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় যে উন্নয়নের মুখাপেক্ষী জনগোষ্ঠী থেকে দরখাস্ত চাওয়া হয়নি, চাওয়া হয়েছে প্রতিভা-সম্পন্ন, শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে যারা অন্যের ভালো করার এই গুরুত্বপূর্ণ দেশপ্রেমী দায়িত্ব চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করবে (সেই যে একটা কথা আছে না, "let's make the world a better place")। যেভাবে উন্নয়নের চিন্তক ও কর্মীদের মধ্যে দলভাগ নিশ্চিত করা হয়, তেমনি এই কর্মকান্ডে 'গিভার' ও 'টেকার' এর ফারাকও সুস্পষ্ট হওয়া জরুরি। মাঝে মাঝে প্রতিনিধিত্ব করিয়ে নেওয়া ছাড়া (যার ফলে জ্ঞানীর জ্ঞানদানের মহিমা ও মহানুভবতা প্রতিষ্ঠিত হয়), এই দরিদ্র, 'অসহায়' জনগণকে অজ্ঞ হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়। ধরে নেওয়া হয় যে দরিদ্র, অসুস্থ, অপুষ্ট, অশিক্ষিত এইসব মানুষেরা যে(ম)ন ইতিহাসের আদি কাল থেকেই এই অবস্থায় প্রাণধারণ করছেন, তাঁদের কাছে এইসব শব্দগুলির আর কোনো অর্থ নেই, কোনোদিন ছিলও না। তাই তাঁদের সমৃদ্ধ, শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত মানুষদের কাছ থেকে এইসব শব্দের অর্থ শিখতে হয়। জ্ঞানীদের কাছ থেকেই ক্রমে তাঁদের জানতে হয় যে তাঁরা নিজেরা কী কী সমস্যায় আছেন। সেই সঙ্গে, এইসব সমস্যা থেকে নিষ্কৃতির উপায় সম্পর্কে জ্ঞানের দান গ্রহণের জন্যও তাঁদের অপেক্ষায় থাকতে হয়। কেউ বলে দেন কয়টি সন্তান জন্ম দেওয়া সঠিক, কেউ জানান সন্তানকে কী খাইয়ে, কী টীকা দিয়ে, কী পরিয়ে বড় করতে হবে, কেউ নির্দেশ দেন জমিতে কোন সার, কোন বীজ দিয়ে কোন ফসল ফলাতে হবে আর তা কোথায় কাকে কত দামে বিক্রি করতে হবে, আবার কেউ পরামর্শ দেন কীভাবে কোন খাবার কেমন করে রান্না করে খেতে হবে (সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের অর্থসাহায্যে, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর এবং সিনি নামক এনজিওর উদ্যোগে নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার খুলে গ্রামে গ্রামে মায়েদের রান্না শেখানোর প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, কারণ মায়েরা ঠিকঠাক রান্না না জানার ফলে শিশুরা যথাযথ পুষ্টি পাচ্ছে না)। একদিকে যেমন উন্নয়নের একটিমাত্র জ্ঞানই আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছে তেমনি অন্যদিকে এই একটি ধারণার সাহায্যে সাও পাউলোর ফাভেলা-র বাসিন্দা, ইস্তানবুলের ঝুপড়িবাসী, মুম্বইয়ের ধারাভির অধিবাসী আর নাইরোবির রেললাইনের ধারের বস্তিবাসী, সকলেই একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সে বর্গটি হল, অজ্ঞ ও সাহায্যপ্রার্থী দরিদ্র। তাঁদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানোর ইতিহাস, ভূগোল,সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক পরিস্থিতি, সবকিছুকে ছাপিয়ে একটিমাত্র পরিচয় ও বাস্তবতা বেঁচে থাকে, তা হল তাঁদের বর্তমান, তাঁদের বস্তুগত দারিদ্র্য। উন্নয়নের জ্ঞানের দান 'ভালো করা'র বিজ্ঞাপনের সাথে সাথে জ্ঞানীর মর্যাদা ও মহিমাও প্রচার-প্রতিষ্ঠা করে চলে। রবীন্দ্রনাথ এই বাইরে থেকে 'ভালো করা'র সংস্কৃতির অতুলনীয় সমালোচনা রেখেছেন,

... আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।... লোকের সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিয়া যদি তাহার হিত করিতে যাই তবে সেই উপদ্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহার হিত হইবে।... যদি নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষকে আমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি।... তাই এ-কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে

যে, আমরা যাহাদিগকে দূরে রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়া সেই অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনো ফল নাই। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকহিত, কালান্তর]

একটি প্রশ্ন এখানে সহজেই উঠতে পারে, উন্নয়নের অর্থনীতি এহেন আত্মবিশ্বাস লাভ করল কীভাবে? কীভাবে উন্নয়নের জ্ঞান দারিদ্র্য, অনুন্নতির একমাত্র গ্রহণীয় জ্ঞান হয়ে উঠল? এর পিছনে উন্নয়নের তাত্ত্বিক চরিত্রের কোনো ভূমিকা থেকেছে কি? আমার প্রস্তাবে, এর উত্তর হ্যাঁ-ই হওয়া উচিত। উন্নয়নের অর্থনীতির ধ্রুব হয়ে ওঠার পিছনে অর্থনীতির 'সত্য' জেনে যাওয়ার দাবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে উন্নয়নের সর্বজনীন চেহারার আড়ালে তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিটি হল এর অর্থনৈতিক জ্ঞান। সে সময় থেকে উন্নয়নের অর্থনীতি এক জরুরী এবং পৃথক বিষয় হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করে, প্রায় সেই একই সময় থেকেই অর্থনীতি এক ঐতিহাসিক কাঠামোগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়। মোটামুটিভাবে ১৯৪০ এর আগে প্রায় সব অর্থনীতিবিদরাই ছিলেন রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ, এবং তাঁরা অর্থনীতিকে আন্তর্বৈষয়িক হিসাবেই দেখতেন। অর্থনীতি ছিল সমাজ-চর্চা, যে চর্চা রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত। ১৯৪৯ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান প্রথম তৃতীয় বিশ্বকে দরিদ্র, অসুস্থ, বেচারা বলে ঘোষণা করে তাঁদের জীবনে হস্তক্ষেপের ন্যায্যতার প্রচার করলেন। তার এক বছর আগে, ১৯৪৮ সালে অর্থনীতির একটি পাঠ্যবই প্রকাশিত হয়, যার নাম, ইকনমিক্স, যার মোট উনিশটি সংস্করণ বেরিয়েছে ২০১০ পর্যন্ত। লেখকের নাম পল স্যামুয়েলসন। এই প্রথম অর্থনীতি নিজেকে বিজ্ঞান বলে দাবী করল, এই পাঠ্যবইতে সংকলিত নানান law, সূত্র, স্বতঃসিদ্ধ ইত্যাদির সাহায্যে। স্যামুলেসনের মত ছিল যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদির মত অর্থনীতিও এক বিজ্ঞান, এবং এথিকস বা নৈতিকতা নিয়ে চর্চা অর্থনীতির এক্তিয়ারের বাইরের বিষয়। স্যামুয়েলসনই প্রথম পদার্থবিদ্যার থার্মোডিনামিক্স, রসায়নের লে শ্যাটেলিয়ারের সূত্র ইত্যাদির প্রয়োগ ঘটান অর্থনীতিতে। শুধু তাই-ই নয়, স্যামুয়েলসনের আগে অঙ্কের এত ব্যাপক ব্যবহার অর্থনীতিতে দেখা যায়নি।

সেসময় পশ্চিমে পাবলিক হেলথ আন্দোলন এবং জার্মতত্ত্ব-সহ জীববিজ্ঞানের নানান অবদান, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের নানান আবিষ্কার পৃথিবীর এবং মানবসমাজকে বোঝার এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করেছিল। জড়-পৃথিবীর ক্রিয়াশীলতার বিবিধ সূত্র, নিয়ম-কানুন ইত্যাদির আবিষ্কার ও ব্যাখ্যার সাথে সাথে এই বৈজ্ঞানিকতার যুগ শিল্প বিপ্লবোত্তর দেশগুলিতে মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং দৈর্ঘ্যও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে যেকোনো বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার এক প্রশ্নাতীত গ্রহণযোগ্যতা তৈরী হয়, যার ভাগীদার হওয়ার আকাঙ্খা অর্থনীতিতেও দেখা যায়। অর্থনীতিও সামাজিক বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক মডেল শুরু করে, এবং তার জন্য অঙ্ক এবং রাশিবিজ্ঞানের ভাষার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। পদার্থবিদ্যা থেকে অর্থনীতি ধার নেয় ভারসাম্য বা equilibrium-এর ধারণা, যার প্রয়োগের ফলে মানুষের সিদ্ধান্ত, কাজকর্ম ইত্যাদির চর্চা ও ভবিষ্যৎ বাতলানোয় অর্থনীতির ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাস বাড়তে থাকে। এই ধারণার ভিত্তি ছাড়া বাজারের ক্ষমতার উপর ভরসা তৈরি হতে পারে না। বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যে পৌঁছানোর অলৌকিক নৈপুণ্য ধোপে টেঁকে না, যদি ভারসাম্যের ধারণার উপর কোনো বিশ্বাস না থাকে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে অ্যালফ্রেড মার্শাল বলেছেন, আমরা জিনিসপত্র কেনার জন্য যে দাম দিই, মুনাফা করার জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ করি অথবা যতটা মজুরি পেলে আমরা কাজ করতে রাজি হই, এ সবই সংখ্যা (numbers বা quantity), যাদের অঙ্কের দ্বারা সুবিধামত কাজে লাগানো যায়, অর্থনীতিবিদরা প্রয়োজনমত যার বিশ্লেষণ করতে পারেন। অর্থনীতির এই বিজ্ঞান 'হয়ে ওঠা'র প্রবল আকাঙ্খা জন্ম দিয়েছে মানুষের ব্যবহারের আইনের, যে আইন অনুযায়ী চললে তবেই তাকে যুক্তিপূর্ণ (rational) মানুষ বলা হয়। এই আইনগুলির মধ্যে অন্যতম হল অনন্ত অসন্তুষ্টি নিয়ে একের চাহিদার অন্যের উপরে প্রভাব সম্পর্কে চিন্তা না করে ক্রমাগত বেশী প্রাপ্তির পিছনে ছুটে চলাই হল মানবিক যৌক্তিকতা। একে বলা হয় যৌক্তিকতার স্বতঃসিদ্ধ (axioms of rationality)। মানুষকে একপ্রকার স্বার্থপর, প্রাপ্তিবর্দ্ধক অণু হিসেবে ধরে নেয় এই স্বতঃসিদ্ধগুলিতে, যার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক অর্থনীতির মডেল, তত্ত্ব, পলিসি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা। আধুনিক অর্থনীতি অনুযায়ী সমাজ হল এই ধরণের যৌক্তিক-অর্থনৈতিক মানুষের যোগফল (যাদের মধ্যে বেচাকেনা ছাড়া কোনো সম্পর্ক নেই)। সুতরাং মানুষের ব্যবহারই হল সামাজিক অর্থনৈতিক চর্চার মূল ভিত্তি। আধুনিক অর্থনীতির যেকোনো পাঠ্যবইতে সূচনাতেই নিম্নোক্ত মর্মে লেখা থাকে,

The fundamental problem facing individuals and societies alike is the fact that our wants exceed our capacity for satisfying those wants. [উইলিয়াম রোলফ, ইনট্রোডাকশন টু ইকনমিক রিসনিং, পিয়ার্সন পাব্লিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ৪]

অর্থাৎ মানুষ প্রাথমিকভাবে সুখবাদী (hedonistic)। সমাজে যেসব জটিল কারণে মানুষের ইচ্ছা-বাসনা তৈরী হয়, যার অসামান্য তত্ত্বায়ন করেছিলেন থর্স্টেন ভেবলেন, সেগুলিকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক বিজ্ঞান মানুষকে নিয়মানুবর্তী অণুতে পর্যবসিত করে। ১৯১৯ সালে ভেবলেনের বক্তব্য ছিল,

[I see human beings as] products of... hereditary

traits and past experience cumulatively wrought out under a given body of tradition, eventualities, and material circumstances. [ভেবলেন, থিয়োরি অফ দি লিজার ক্লাস, ১৯১৯]

বেশীর ভাগ মূলধারার আধুনিক অর্থনীতিবিদেরা বাস্তব পৃথিবীর ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যতের বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও (যার দুটি কারণ হল যৌক্তিক-অর্থনৈতিক মানুষের সীমাবদ্ধ অনুমান এবং প্রকৃতিগত ভাবেই জিনিসপত্র প্রাপ্তির চাহিদা মানুষের অসীম একথা ধরে নেওয়া) এই দাবী বজায় রাখেন যে তাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করছেন। শুধু তা-ই নয়, আধুনিক অর্থনীতির মডেলগুলি সাধারণত তাদের ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতা বাদ দিয়েই তৈরী হয়, এবং ধরে নেওয়া হয় অর্থনৈতিক কাজকর্ম এবং রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। আধুনিক অর্থনীতির বিজ্ঞান হয়ে ওঠার এই উচ্চাকাঙ্খার ফলে সামাজিক চর্চার বিষয়গুলির মধ্যে অর্থনীতিকে Imperial social science অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে উন্নয়নের ধারণার মধ্যে আধুনিক অর্থনীতির ছায়া কতখানি সুস্পষ্ট। রাজনীতি-বিহীন, ইতিহাস-বিহীন দারিদ্র্য ও অনুন্নতির সমস্যার সমাধানে বৈজ্ঞানিক সত্য-ভিত্তিক অরাজনৈতিক সমাধানের কালাপাহাড় মানুষকে যৌক্তিক, অর্থনৈতিক হয়ে উঠতে শেখাতে চেষ্টা করে। উন্নয়নের বক্তব্যের মধ্যে যে প্রাচুর্যের জীবনের হাতছানি আছে, তা সম্ভব কেবল যদি এযাবতকাল ধরে গোষ্ঠীর, প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বসবাস করে চলা মানুষেরা এইসব অর্থনীতির বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেন কীভাবে more is better মেনে নিয়ে যৌক্তিক হয়ে উঠতে হয়, হয়ে উঠতে হয় 'অর্থনৈতিক মানুষ' (economic man)।

পায়েল পাল

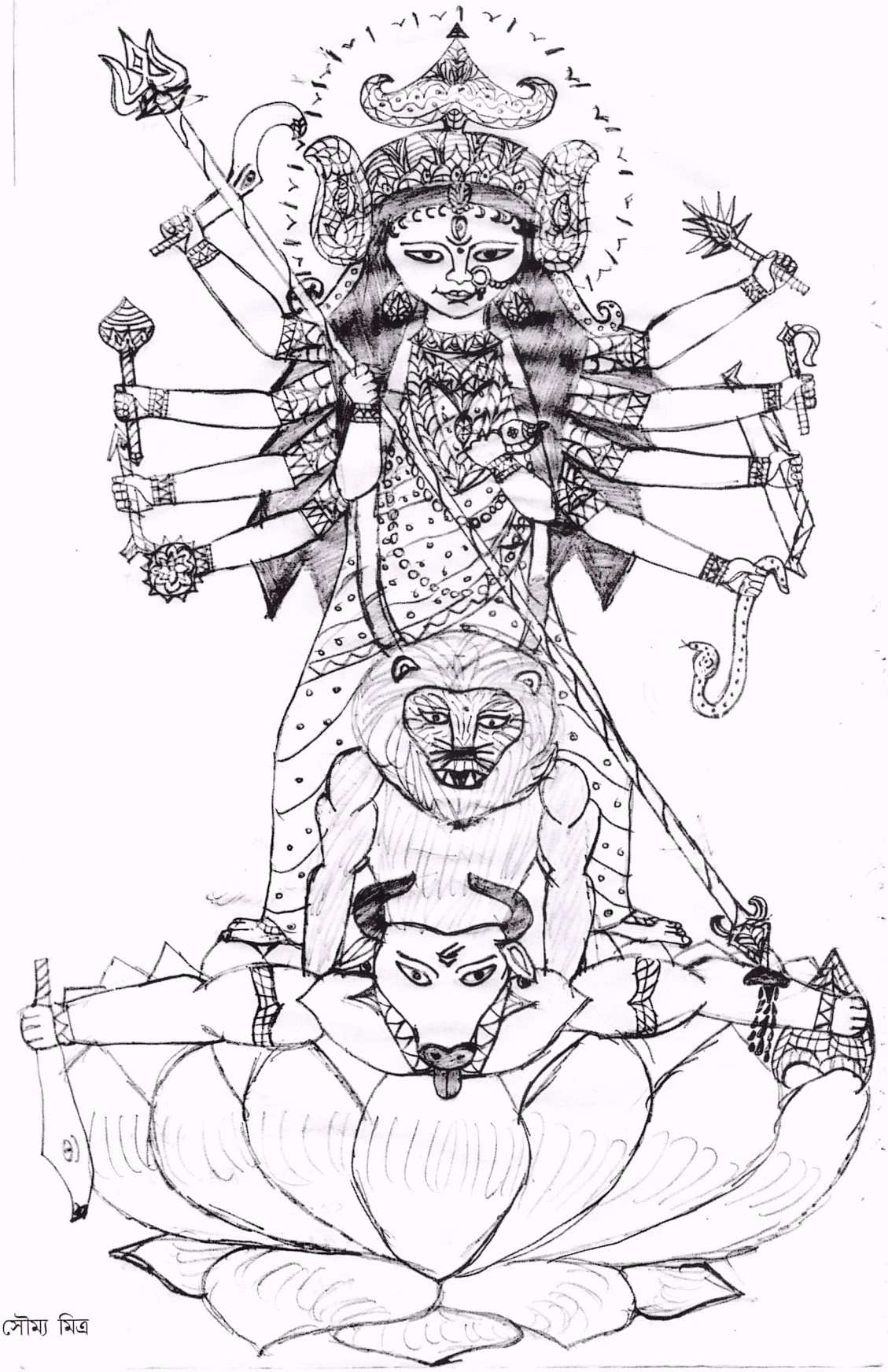

সৌম্য মিত্র

ভাবী নাগরিক

শুভজিৎ সাহা

ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

জীবনের পথ চলতে চলতে,
ধুঁকছি আমরা সবাই,
বইয়ের চাপে, জ্ঞানের তাপে
আমরা স্টুডেন্ট ভাই।
তথাকথিত সভ্য দেশের,
লক্ষ্য এখন এটাই,
হয় ডাক্তার, নয় ইঞ্জিনিয়ার
হবে নাকি সব্বাই!
এ পথেতে চললে পরে,
হবই হব মানুষ,
ব্যর্থ হলে চোখ রাঙিয়ে
বলবে অমানুষ।
অভিভাবকরা হয়ে উঠেছে
এই জীবনের চালক,
সবাই ভাবে আমরা এখনও
দুগ্ধপোষ্য বালক।
লোক দেখানো পড়াশুনোয়
হয় কি কিছু লাভ?
এই পড়াশুনোই হয়তো হবে
জীবনের অভিশাপ।
কারোর কথা শুনো না বন্ধু,
মনের কথাই শোনো,
নইলে আজ থেকে তুমি তোমার
দুঃখের দিন গোনো।

মা

সুপর্ণা মালিক

ছাত্রী

তুমি আমার মা
আমার মিষ্টি সোনা মা,
ছোট্টোবেলায় দিয়েছি তোমায়
কত যে যন্ত্রণা।

আমার জীবনের প্রেরণা তুমি
তুমিই আমার সর্বভূমি,
পারি যেন মা রাখতে তোমায়
সকল গর্ব-অহংকারে।

তুমি আছো সদা আমার সাথে,
বিপদে রেখেছি হাত তোমার হাতে।
প্রাণ খুলে মোরে কর আশীর্বাদ,
মেটাতে পারি যেন মা তোমার মনের স্বাদ।

আগমনী

পায়েল পাল

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

শিউলি ফুলের গন্ধ তোমার,
আগমনী বার্তা আনে।
বাঙালিরা ঘরে বসে—
তোমার আসার দিন গোনে।
পথে পথে ক্লান্ত বাউল,
আগমনী গান শোনায়।
তোমার আসার আনন্দে—
শিশুরা সব দিন কাটায়।
কি অদম্য শক্তি তোমার!
কি দুর্দান্ত সাজ!
এত শক্তির মধ্যেও যেন,
জড়িয়ে আছে লাজ।

বিশ্বরূপের প্রতীক তুমি;
অন্যায়ের ধ্বংসকারিণী,
তুমি মা আদ্যাশক্তি,
ত্রিকাল বিজয়িনী।
প্রতি বছর আসো গো তুমি,
নতুনত্ব নিয়ে।
প্রতি বছর যাও গো তুমি,
এ ভূবন রাঙিয়ে।

এত বড় সত্যি

আশিস পাল

বাণিজ্য বিভাগ

বহু বছর আগের এক আলোচ্য ছবি,
যার নাম 'গল্প হলেও সত্যি'।
বহু বছর পর বাঙালির মণ্ডপে এমন কি হল,
যা এত বড় সত্যি!
তিন মাস ধরে বহু রাস্তার ধারে,
লাল বোর্ডেতে ছিল সত্যি লেখা।
মানুষের মনে বাড়ছিল সন্দেহ,
কেমনে যাবে তা দেখা?
কিছু দিন পরে পৃথিবীর বড় দুর্গা দাঁড়াল,
শহরের এক নামী উদ্যানে।
কে তখন জানত সে উদ্যান শীঘ্রই,
রূপায়িত হবে মরুদ্যানে।
তৃতীয়াতে মায়ের বোধন হল,
উদ্যানে জ্বলল অনেক বাতি।
কে তখন জানত পঞ্চমীতেই সেথা,
নামবে অন্ধকার রাতারাতি!
এ-ও দেয় উঁকি, নিয়ে প্রাণের ঝুঁকি,
দেখা যাবে কি? মাকে এক বার।
কড়া শাসনে মায়ের মুখ গেল ঢাকা,
মা-কে দেখা মেলা দুর্বার।
সত্যি সত্যি বঙ্গের পূজা কাটল,
কখনো আনন্দ কখনো বিষাদে।
সত্যি বলছি মাকে আর গড়ব না বড়,
পূজাকর্তাদের আজো মন কাঁদে।
পূজা হল শেষ ক্ষুদ্রাকারে 'মা'-দের,
বিসর্জনের এল পালা।
এত বড় 'মা' তুই! তোর স্থান হবে
মর্তের কোনো সংগ্রহশালা।

নারীদের আত্মকথা

মৌসুমী মণ্ডল

ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

সারা দেশটা জুড়ে চলছে নারীদের উপর চরম অত্যাচার
সবাই সেটা দেখেও চুপ! করছে না-এর কোন প্রতিকার।
প্রতিদিন দৈনিকপত্রে লিখছে নারীদের শোষণের কথা
সকলে সেটা পড়ছে, কিন্তু বুঝছে না নারীর করুণ ব্যথা।
সময়-এর পর সময় যাচ্ছে চলে দিনের পরে দিন
আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থাটা বদলাবে কি-কোনদিন?
নারীদের উপর হচ্ছে ধর্ষণ, বধূ-নির্যাতনের মতো অত্যাচার
আমরা আর কত দিন হব এই নির্মম অন্যায়ের শিকার?
প্রায় দিনই মাতৃগর্ভে হচ্ছে বহু কন্যাভ্রূণের নৃশংস হত্যা
কারণ পুত্র-সন্তান জন্ম দিলে বাড়বে শ্বশুরবাড়ির বংশমর্যাদা।
ঝাঁসির রাণী, প্রীতিলতার মতো নারীরা দেশকে করেছে গর্বিত,
কামদুনি ও দিল্লীর দামিনীর জন্য দেশবাসী আজও শোকাহত।
১৯৪৭ সালে হয়েছে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীন,
এই স্বাধীন দেশের নারীরা আজও হয়ে আছে পরাধীন।

মোমবাতির মিছিল

প্রিয়া মণ্ডল

ছাত্রী, এডুকেশন বিভাগ

তাকে রোজ দেখি মোমবাতির মিছিলে,
শোরগোল, বড় বড় ভয়ানক পোস্টারে,
আমার ফেসবুকে রক্তমাখা নোটিফিকেশন!
তবু, তার চশমার ফাঁকে আজো আলো জ্বলে ওঠে
পুকুরে তার ছবি রকমারি,
শ্যামবর্ণের ঐ মানুষটারই বোধহয় রক্তে বিষ মিশেছিল।
মোম নয়, বাতি নয়, আর চুপ থাকা নয়,
গর্জে ওঠো—

ওরা আমার দু বছরের মেয়েটাকেও ছাড়েনি,
কত জলসা ঘরে নেচেছি, ঘুঙুর ছিঁড়েছে,
বাতি আরো জ্বলেছে আর কিছু সর্বনামের দাগ।
ছোঁয়াচে ভালবাসা কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে
আজ নীরস এক সংসারে;
গলা টিপে গায়ে দেয় কেরোসিনের সুবাস
ওরা শেষ প্রশ্ন করল "তুই মেয়ে?"
আমি নির্বাক, মিছিল তবুও যায় এগিয়ে,
নাটক, গোঁড়ামি আর রাজনৈতিক কিছু চাল,
আমার ক্ষত-বিক্ষত দেহকে আরো করে ক্ষত,
তবু বাঁচার ইচ্ছে সেই শ্যামবর্ণের মানুষটির হাত ধরে
আমার ভাঙা বাঁশিতে তার শেষ ঠোঁটের স্পর্শ
কিছু গন্ধ মনে করায় আমরা হারিয়ে গিয়েছি।
আমার চোখের কাজল মিলিয়েছিল
কত যে অশ্রু ফোটায়
ওরা কি সেই দাম দেয়?
আমার শরীরে যতটুকু শক্তি ছিল
ওই শক্তিশালী দানবেরা তা নিংড়ে নিয়েছিল
সহানুভূতি, প্রতিবাদ সব একদিনে শেষ হল মিছিলের শেষে
তবুও আমার মৃতদেহ কফিনের কাঁধে
ভেসে যায়
দূর থেকে আরো দূরে।

ভারতবর্ষ

সত্তম দাস

ছাত্র, এডুকেশন বিভাগ

রত্নগর্ভ বিশ্বজননী, তুমিই দেব ভূমি।
জননী যাহারে জন্ম দিয়াছে, ধারণ করেছো তুমি।
দেবাত্মা হিমালয় মুকুট শৃঙ্গ তোমার।
বক্ষে দুলিছে সুনীল জলধী, গঙ্গা নাম তাহার।
সভ্যতারে সৃষ্টি করেছো, বিশ্ব চরাচরে
বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছো, জগৎ সংসারে।
বারে বারে প্রভু জনম লভিল বক্ষ মাঝে তোমার
কর্ম যজ্ঞ রচনা করেছে, অন্ত নাই যাহার।
সবারে তুমি করিয়াছ দান, শ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম
নানা জাতি, ভাষা, সংস্কৃতির মিলন মহান কর্ম।
পরম বৈভবশালিনী তুমি, বিশ্ব বরেণ্য গাথা
কালের তরঙ্গে শঙ্কিত হিয়া, সে রূপ তোমার কোথা।
যুগে যুগে তুমি লুণ্ঠিত মাগো! উদ্ধার তব কবে?
জগৎ সভায় ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

ব্যথা

সুতনু ভট্টাচার্য

ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

মনে কি পড়ে তোমার
কিছু বছর আগের কথা।
অনুভব কর কি তুমি,
আমাকে না দেখার এই বিরহ ব্যথা।

শিখিয়েছ তুমি দেখিয়েছ তুমি
জীবনের এই সার্থক পথ
দিয়েছ তুমি হাজার হাজার
জ্ঞান শক্তি অনেক মত।
জ্ঞানের পাহাড়ে উঠেছি আজ
তোমারই হাত ধরে
কালের নিয়মে আজকে হায়তো
যেতে হল তোমায় ছেড়ে।

দেখেছি তোমার হাসি মুখ
দেখেছি তোমার অশ্রুজল
তাই তো পড়লে তোমায় মনে
আসে আমার চোখে জল।

বন্ধু দিয়েছ জ্ঞান দিয়েছ
বলেছ ভাল অনেক কথা
শক্তি দিয়েছ কাছে টেনেছ
পূর্ণ হয়েছে মনের খাতা।
তোমার পানে চেয়ে থাকিলে
মনে পড়ে কত কলরব,
যতই বলি তোমার কথা
বলা হবে না সব কথা।
বারে বারে তাই তোমার কথা ভাবতে ভাল লাগে
কত অতীত কত ভালবাসা মনের মধ্যে জাগে।

এবার হবে না পূজা

সুদাম দাস

ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আমার খেলার সাথীরা কেউ নাই যে গ্রামের ঘরে,
আজকে আমার পূজার দিনে মন যে কেমন করে।
কোথায় গোপাল, বিভাস, কানু,
শান্তি, সোনা, রুপা, ভানু?
গ্রাম ছেড়ে মা কোথায় তারা বল একে একে?
চোখে আমার অশ্রু ঝরে তাদের স্মৃতি ভেবে।

বদ্যিপাড়ার রেখার বাবার মস্ত জমিদারী
কোথায় তারা গেলেন মা গো ফেলে বসত বাড়ি?
পূজার দালান শূন্য আজো,
নাই প্রতীমা পূজার সাজও,
এবার গাঁয়ে আসবে না কি মাতা দশভূজা?
জমিদারের বাড়িতে মা হবে না কি পূজা?
শরৎ কালের রঙিন ছবি ভাসে যখন মনে,
বুকের মাঝে কি সে ব্যথা বাজে ক্ষণে-ক্ষণে।
নতুন জামা-কাপড় পরে
সঙ্গীগণের গলা ধরে
মনের সুখে ঘুরে বেড়াই পাড়ার ছেলের সাথে
শরৎ কালে পল্লীমায়ের সোনার আঙিনাতে।

শিউলি ফুলে মালা গেঁথে, শাপলাতে হার গড়ি—
গলায় দিতাম স্থলপদ্ম কমলের মুকুট মাথায় পরি
আনন্দে মেখে ফুলের রেণু
বনে বনে বাজাই বেণু,
এমনি করে খেলেছি মা শরৎকালের খেলা,
এখন হেথা আর বসে না ছেলেমেয়ের মেলা।

সঙ্গীহারা নিঝুম পাড়া, মন কি হেথা টিকে?
চল না মা গো গ্রামবাসীরা গিয়েছে সেই দিকে।
এত কিসের ভয় ভাবনা?
সেথায় কি আর ঠাঁই পাবে না?
যেথায় গেছে আমার সকল বন্ধু খেলার সাথী
সেথায় গিয়ে পুজোর দিনে করব মাতামাতি।

গুরু দক্ষিণা

মহুয়া গায়েন

ছাত্রী, এডুকেশন বিভাগ

প্রবীণ থেকে প্রবীণতর যাহাই শ্রেষ্ঠ যাহাই বড় সবই তোমাদের জন্য
আঁধার মিটায়ে জ্বালায়েছ দীপ জীবন করেছ ধন্য।
পিতা-মাতা যাহারে জন্ম দিয়াছে তোমরা দিয়াছ প্রাণ,
জানি না কতটা শিখিয়াছি পাঠ রাখিয়াছি তব মান।
বারে বারে শত লাঞ্ছনা সয়ে, তবু করিয়াছ ক্ষমা,
যেটুকু ঘৃণ্য, যেটুকু মন্দ, রাখো নাই কভু জমা
যখনই মোরা মাটিতে পড়েছি বক্ষে লয়েছো তুলি
জননীর ন্যায় স্নেহ হস্তে ঝেড়েছ মোদের ধূলি

যতবার মোরা পাহিয়াছি ভয়, দিয়াছে সাহস হে গুরুদয়।
করেছ মোদের চিত্ত উদয়।
সমাজের কাছে গরল যাহা কণ্ঠ ভরেছ সে বিষে;
ফিরায়ে যখন দিয়াছ মোদের ছিল অমৃত মিশে।
হে গুরুদ্বয়, হে দেবগণ, হে অনন্ত বীর,
চরণ স্পর্শী তোমাদের বারে বারে নত শির।

My Friends

Dip Mukherjee

ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

In this short span of life,
We have come across many relations,
Those were tied with bonds of heartfelt emotions,
But in my life, you all are the only one,
Who can bid this life a sweet and a sound conclusion...
For you all, my soul is still alive,
In your absence, I would have just silently quit this life...
Always at times of my need,
It was you, who forwarded a hand for me to succeed.
Today, standing in this verge of separation;
I am losing my usual power and courage,
To have control over my feelings and emotions...
But friends, if I'm not an insane;
If there is God in heaven and heavenly waters in rain,
Then, my tears remembering you will not go invain,
And before lying "lifeless" in that death bed;
Someday... somewhere... in this path of life,
I will surely meet with you all once again...
(Good bye...)

Population Theory — The major views

Indrani Chakraborty

The subject 'Economics' is considered as a branch of Social Science. A subject is treated as social science when it is concerned with the society and the relationship among the individuals within a society. The history of Economics can be traced back to thousands of years. The last 300 years can be considered as the beginning of the modern day Economics.

The word 'Economics' originates from the Greek word 'Oikonomikos'. 'Oikos' means home and 'Nomos' means management. If the society is considered as a family, then the society faces the problem of managing unlimited wants of the members of the society within its limited resources.

Economics describes the factors which determine the production, distribution, and consumption of goods and services. 'Scarcity of resources' is the fundamental economic problem. Society has insufficient productive resources to fulfill all human wants and needs. Choices must be made among a limited set of possibilities of producing alternative goods and services using limited amount of resources. The resources or factors which are used to produce goods and services are land, labour, capital, entrepreneurship.

Land is the natural resource on the planet. It includes the space on the ground, hills, seas, ocean, air etc.

Labour is the human input into the production process, like workers, managers.

Capital is man-made physical goods to produce other goods and services.

Entrepreneurship completes the managerial functions of gathering, allocating, distributing economic resources or consumer products to individuals and other business in the economy.

Labour is one of the most essential factors of production which is supplied by the population of an economy.

The basic objective of an economy is to maximize the production of goods and services by the efficient use of its available resources. It can be said that as an economy possesses more and more resources it is in a favourable position to produce and consume more. So, the population and its growth rate affect the economy to a large extent. Population size and change in the age structure of population over time are significant issues as far as development and growth of an economy is considered.

From ancient time only, many intellectuals have remarked in the issue of 'Population'. For example, Kautilya, the writer of Arthasastra was in favour of huge population and wrote that 'a large population is a source of political, economic and military strength of a nation.' The Chinese philosopher Confucius argued that a numerical balance should be maintained between the population and the environment. Modern thinkers like Adam Smith, David Ricardo and others have also commented on the

অর্থনীতি বিভাগ

population issue.

The most recognized population theory is the Malthusian theory. Thomas Robert Malthus (1766-1834) analyzed the population statistics. He generalized the relationship between population factors and social change. In his essay "On The Principle of Population" Malthus argued that the population could increase by multiples, doubling every twenty-five years. According to him, population, when unchecked, increases in a geometric progression (1, 2, 4, 8 and so on), while food supply increases in an arithmetic progression (1, 2, 3, 4 and so on). He said that the gap between the food supply and population will continue to grow over time. Even if food supply grows, it would be insufficient to meet the needs of the population.

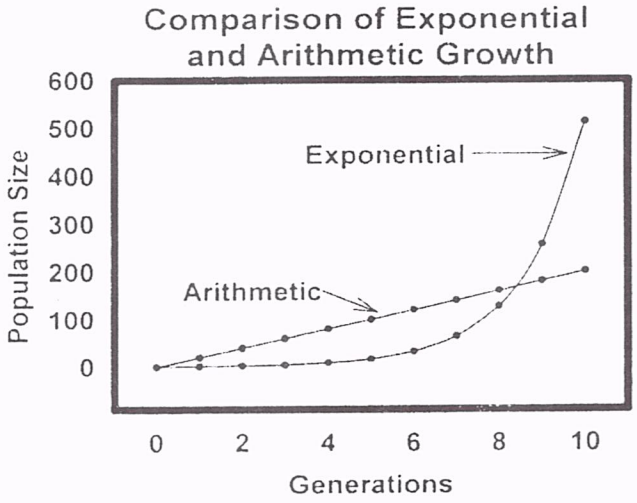

Malthus knew well that population cannot grow long beyond the means of subsistence ("population must always be kept down to the means of subsistence"). He referred to 2 classes of checks to keep population down:

1. Prevention check: He suggested the artificial means of birth control and some measures to check the birth rate, such as late marriage, moral restraint, chastity.
2. Positive check: He spoke of natural calamities like famine, diseases and war that increases death rate and works as nature's check against population.

Malthus argued that the positive and preventive checks are inversely related to each other - that means where positive checks are very effective, the preventive checks are less effective and vice-versa.

Many economists have criticized Malthus by arguing that he did not take into account the role of changing technology and consequent transformation in the socio-economic set-up of the society.

Economists such as J. S. Mill and J. M. Keynes supported his theory whereas others, especially sociologists, are against his theory. They argue the widespread poverty and low standard of living are caused by misconceived organization of society. According to Karl Marx, starvation is caused due to unequal distribution of wealth and its accumulation by capitalists. It has nothing to do with population.

Malthus's opinion about overpopulation and attendant resource scarecity has not been true till now. Rapid advances in agricultural, medical, industrial technology have allowed global economic productivity to keep pace with rising population, Family size is naturally declining worldwide due to higher living standard, increased availability of economic opportunities and liberty of women.

The Great Depression of the 1930's adversely affected the world economy. The birth rate sharply fell in the industrial (western) nations. Schemes were proposed to encourage the families to have more children by giving them allowances for each child born.

The discussion by Alva and Gunnar Myrdal in the book "Crisis in the Population Question" published in 1934 sup-

ported this. This book discusses the declining birth rate in Sweden and proposed possible solutions. Sweden's population was declining in the 1930's resulting reduced productivity and standard of living. They criticized Malthusian and neo-Malthusian theories.

Alva and Gunnar Myrdal were in favour of an increased birth rate. They pointed out that if birth rate continues to decline, then at the end of the 1970's, there would be twice as many elderly people in relation to the individuals in the working ages of the 1930's. That would create serious supply problems. The dependent population will be more than the working population. That will increase the expenditure more than the total production.

In this context, they proposed that population policy should focus to persuade the majority to give birth to, say, for example, three children. They proposed intelligent nationalism, in which families with children should be supported by various reforms such as free medical care, free school lunches, child benefit, more and better housing, affordable housing, and subsidized rent and so on. They wanted that both parents would take part of direct production system of the society rather than the mother becoming a simple homemaker.

To make the mothers free the children can be kept in some institution under trained staff, while parents are working. This would provide a positive economic impact as well as educational benefits to each individual child. Alva & Gunnar Myrdal tried to see the problem of population in the context of economic recession which hit the western world. They not only wanted an overall increment in productivity of the economy but they concentrated on the increased well-being of the people and improved standard of living. They also stressed on the promotion of child bearing and at the same time enjoying individual liberty, especially for women. Malthus gave a generalized idea about the population problem, the Swedish couple took a particular instance of practical problem which was present that time in the so-called developed western economies like Sweden.

The situation of the underdeveloped countries like India, Africa, Bangladesh was just the opposite immediately after the World War II. The birth rate rose sharply and birth control programme had to be initiated to control population so as to eliminate starvation. These economies were not industrialised economies at that time; rather they were in the stage of subsistence level of agricultural production.

It may be conducted that the problem of population should not be discussed from a general point of view. But the different transitional stages of the economy should be considered while analyzing this problem. After World War II, the political scenario of the world changed a lot. The underdeveloped world also gradually started to emerge as industrialized economies. It was accepted that rapid industrialization can only develop the backward countries. In this changed scenario, another theory of population came into limelight which was discussed first by Warren S. Thompson (1929) and later by Frank W. Notestein (1945). This is the theory of demographic transition. Thompson observed changes, or transitions, in birth and death rates in industrialized societies over the previous 200 years. The transition involves four stages, or possibly five.

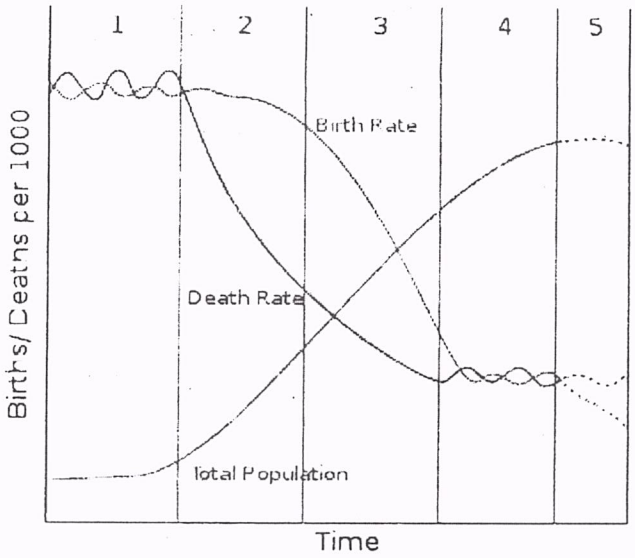

In stage one, the pre-industrial society, death rates and birth rates are high and roughly in balance. Population growth is typically very slow in this stage, because the society is constrained by the available food supply.

In stage two, that of a developing country, the death rates drop rapidly due to improvements in food supply and sanitation, which increase life spans and reduce diseases. The improvements specific to food supply typically include selective breeding and crop rotation and farming techniques. Other improvements generally include access to technology, basic healthcare, and education. Public health improved primarily in the areas of food handling, water supply, sewage, and personal hygiene. The increases in female literacy combined with public health education programmes in the late 19th and early 20th centuries helped to lower the death rate.

In the third stage, birth rates fall due to access to contraception, increases in wages, urbanization, a reduction in subsistence agriculture, an increase in the status and education of women, a reduction in the value of children's work, an increase in parental investment in the education of children and other social changes. Population growth begins to level off. Birth rate decline is caused also by a transition in values; not just because of the availability of contraceptives.

During stage four there are both low birth rates and low death rates. Birth rates may drop to well below replacement level as has happened in countries like Germany, Italy and Japan leading to a shrinking population, a threat to many industries that rely on population growth. As the large group born during the second stage ages, it creates an economic burden on the shrinking working population.

In the present day world, different countries are at different stages of demographic transition. Most of the developed countries are in Stage 3 or Stage 4 of the model; the majority of the developing countries have reached Stage 2 of Stage 3. The major (relative) exceptions are some poor countries, mainly in sub-Saharan Africa and some Middle-Eastern countries, which are poor or affected by government policy or civil strife. Although this model predicts ever decreasing fertility rates, recent data shows that beyond a certain level of development, fertility rates increase again.

The populations of advanced, urban industrial societies, which have entered the last stage, are now stable with low birth and death rates. This theory does not hold good for the developing countries of the world, which have experienced unprecedented population growth due to drastic decline in death rates. This theory has also faced criticism. In spite of this, this theory provides an effective portrayal of the world's demographic history.

The Greek Financial Crisis

Angana Chatterjee

Greece, by its very name suggests illustrious history, art, culture, invasions, power and courage, which reached its height under Alexander, the great and many more. "Greece" and "Crisis" these two words together seem a complete mismatch. But, how actually Greece fell into such crisis and struggling to overcome - is no less than a fast paced Hollywood thriller which every reader would be curious to know about. Let us now get into the story without further delay.

The Greek economic crisis is making headlines today, but the country's economic problem started several decades ago and has a number of precipitants:

Lack of industrialization: Industrialization in Greece came in the early 1960's and was followed by a rapid shift to small manufacturing in the late 1980's. This change was followed by additional de-industrialization that resulted in a low Gross Domestic Product (GDP) per capita, the deep and long economic recession and the unfavourable influence of manufacturing trade.

Kleptocrats in Charge: The Kleptocratic practice of government officials, not necessary the prime ministers themselves, reached their zenith in the financing of 2004 Olympic Games and the purchase of armaments, especially from Germany for which German Producers received substantial bribes. Worst of all, funds allocated to Greece from the European Union were pocketed by government officials on a systematic basis, many of which found their way into Swiss and Egypt banks.

Taxation Issues: There was an absence of correct and advanced taxation practices. Private residences never paid property taxes, small business operations rarely paid taxes and many large businesses systematically avoided taxation. Employees and retired individuals only paid income taxes. Unemployment reached double digit percentage during the last five years.

From 2008 to Today's Crisis: Greece became the epicenter of Europe's debt crisis after Wall Street imploded in 2008. As the Great Recession that began in the United States in 2007-2009, spread to Europe, the flow of funds lent from the European core countries (Germany & France) to the peripheral countries such as Greece began to dry up. In addition to these, huge pension liabilities along with tax evasion, an expanding government, large military expenditures, growing trade deficits, and $11 billion price for the 2004 Olympics and an anaemic real economy combined to increase Greece's indebtness.

With global financial markets still reeling, Greece announced in October 2009 that it had been understating its deficit figures for years, raising alarms about the soundness of the Greek finances. The debts of the country were 300 billion Euros, 113% of its

অর্থনীতি বিভাগ

GDP, at the time Eurozone has established a 60% limit.

Suddenly Greece was shut out from borrowing in the financial markets. By the spring of 2010, it was veering towards bankruptcy, which threatened to set off a new financial crisis. To avert calamity, the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund (IMF) charismatically known as "Troika" issued the first bailout of 110 billion euros for Greece and it was informed to begin austerity measures, structural reforms and privatization of governmet assets.

A year later, a worsened recession along with a delayed implementation by the Greek Government of the agreed conditions in the bailout programme, revealed the need for Greece to receive a second bailout worth 130 billion euros, including a bank recapitalization package of worth 48 billion euros. The money was supposed to buy Greece time to stabilize its finances and quell market fears that the euro union itself could break up. While it had helped, Greece's economic problems haven't gone away.

However, the improved economic outlook (in 2013-2014 - there was a decline in the unemployment rate and return of positive economic growth) was replaced by a new fourth recession starting in the 4th quarter of 2014, following the formation of a Syriza-led government refusing to respect the terms of its current bailout agreement. The European Union did not know what to expect from the Tsipras administration and the Greek crisis was getting deeper and deeper as Troika suspended all scheduled remaining aid to Greece under its current programmed until such times when the negotiated conditional payment terms were fixed.

2015:

After the Greek election of January 2015, the Euro group granted a further four month technical extension of its bailout programme to Greece accepting the renegotiated payment terms but it was still pending at the end of May. Many European Union officials overtly state that they detest interacting with the Tsipras Government and negotiations became much more difficult so much that the Greek government unilaterally broke off negotiations late on June 26 diverting from their prior agreement to continue negotiating until a mutually acceptable compromise could be presented to the Euro group in the afternoon on June 27.

Instead Mr Alex Tsipras announced on Greek national television a few hours later that a referendum would be held on July 5, 2010, to decide whether Greece was to accept the bailout conditions proposed jointly by the Troika. As a result of referendum, the bailout conditions were rejected by a majority in all of Greece regions. This caused indexes worldwide to tumble, as many were uncertain about Greece's future, fearing a potential exit from the European Union.

On July 13, after 17 hours of negotiations, Euro zone leaders reached a provisional agreement on a third bailout programmed to save Greece from bankruptcy. Meanwhile, short term financing were arranged to help Greece get through July and emergency funding enabled the banks to reopen for the first time since June. But the bailout has been widely criticized and many voiced argued that Greece should leave the euro zone known as a "Grexit". Plenty of politicians and economists, most notably German Finance Minister Wolfgang Schaeuble believes that Greece should leave the Euro, as it needs a debt relief which is not seen as legal within the single currency.

The heavily indebted country faces huge challenges including skeptical creditors who will be watching closely to see if the government follows through on promised changes. It must push a slew of tough economic measures in exchange for crucial rescue funding.

How does the crisis affect the global financial system? Since Greece's debt crisis began in 2010, most international banks and foreign investors have sold their Greek bonds and other holdings, so they are no longer vulnerable to what happens in Greece. And in the meantime, the other crisis countries in the Euro zone, like Portugal, Ireland and Spain have taken steps to overhaul their economies and are much less vulnerable to market contagion that they were a few years ago.

Economic & Social effects of the crisis: Greek GDP fell from 242 billion euros in 2008 to 179 billion euros in 2014, a 26% decline overall. The seasonally adjusted unemployment rate grew from 7.5% in September 2008 to a then record high of 23.1% in May 2012, while the youth unemployment rate during the same time rose from 22.0% to 54.9%. Apart from those, there were huge public debt and annual budget deficit. In February 2012, it was reported that 20,000 Greeks had been made homeless during the preceding year and that 20% of shops in the historic city centre of Athens were empty. By 2015, unemployment in Greece had reached 26% and it was reported by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) that nearly 20% of Greeks lacked sufficient funds to meet daily food expenses

Effect of Greece's Economic Crisis on Public Health: The economic crisis has predominantly impacted the health of vulnerable populations with a rise in suicides and deaths due to mental and behavioural disorders. Greek hospitals are also on the brink of collapse. Government health spending fell 25% in between 2009 and 2012 and spending on drugs dropped by 32% since 2010. Health coverage has been affected by cost cutting measures. In Athens alone, some 4000 doctors have left the city since the crisis began and spending cuts were imposed on the health sector. There is also a high number of top scientists who have left the country. Increases in certain illness such as heart attacks and respiratory problems are associated with the chronic stress suffered by Greeks and worsening living conditions endangered by the crisis.

What happens if Greece exists the Eurozone? Had Greece slid out of the euro after the crash of 2008, it would now be on the road to recovery. Its debts would have devalued, citizens would be in work, and investors would be investing, tourists would be following in. But for the time being the priority is "Grexit". Most agree that in the short term going off the euro would lead to more hardships for the Greek people. Transitioning back to the new national currency "Drachma" would entail months of confusions, hectic negotiations as there is no legal road map for how the exit would work. A currency that comes into existence under these circumstances would likely be extremely weak, have high inflation and that would mean that prices for oil, food would be very expensive.

However, many believe most notably Nobel Prize winning economist Paul Krugman that in the long term reintroducing the Drachma will allow Greece to reinvigorate its economy. At one point, there were fears that a Grexit would send shockwaves through the world's financial markets, but over the past few years, the European Union has taken steps to lower the contagion risk.

European Debt Conference: Economist Thomas Piketty said in July 2015: *"We need*

a conference on all of Europe's debts, just like after World War II. A restructuring of all debt, not just in Greece but in several European countries, is inevitable." He pointed out that Germany received significant debt relief after World War II. A new institution would be required to manage budget deficits within limits across all Eurozone countries. He warned that: *"If we start kicking states out, then the crisis of confidence in which the Eurozone finds itself today will only worsen. Financial markets will immediately turn on the next country. This would be the beginning of a long, drawn-out period of agony, in whose grasp we risk sacrificing Europe's social model, its democracy, indeed its civilization on the alter of a conservative, irrational austerity policy."*

Bibliography:

1. *The New York Times* article published on September 21, 2015.
2. www.conterpunch.org - Effect of Greece's Economic Crisis on Public Health.
3. News and Analysis of Critical Issues in Terrorism & Homeland Defence
4. www.wilipedia.com

The Politics of Exclusion and The Two Mary's – Mary Wollstonecraft and Mary Shelley

Dr. Lily Law

Women like men, have always been a part of the human species. The position of women however in the cultural matrix of the west has amazingly, never been equal to that of men. Women have been looked upon as inferior beings, subordinates in a totality where two component parts - male and female - are necessary and complementary to each other. The word 'Man' in general represents the all-embracing term 'Human'. Woman, on the other hand, is someone who in not a man, she is something negative, she is a person lacking in certain positive qualities - physical, moral and intellectual. This view has lasted till date down the ages, right from the ancient times.

One of the first proposals for reform is Mary Astell's serious proposal to ladies "for the advancement of their true and greatest interest" in 1694. However *A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects* written by the 18th century British feminist Mary Wollstonecraft and published by Joseph Johnson in 1792 is one of the earliest works of feminist philosophy. Mary Wollstonecraft dedicates her manifesto to M Talleyrand-Perigord, Late Bishop of Autun and in her Dedication she refers to Talleyrand-Perigord's ideas on national education. Mary Wollstonecraft was impelled to write *A Vindication* after reading Maurice de Talleyrand-Perigord's 1791 report to the French National Assembly which stated that women should only receive domestic education. Described by the painter Henry Fuseli as a "philosophical sloven" for her unkempt appearance and extravagant ideas, Mary Wollstonecraft (1759-1797) was one of the more loquacious members of the Johnson group. The daughter of a weaver, she started in the only career available to a bright girl without prospects: as a companion and teacher in an uninspiring country family. She stated, reiterated, illustrated and argued for four hundred and fifty-two pages that women were inadequately educated, kept ignorant so they could be easily subjugated. By cultivating the "arbitrary power of beauty" however, women contributed to their own enslavement. Thus in *A Vindication*, Mary Wollstonecraft records her response to those education commensurate with their position in society, claiming that women are essential to the nation because they educate its children and because they could be "companions to their husbands rather than mere wives." Instead of viewing women as ornaments in society or property to be traded in marriage, Wollstonecraft maintains that they are human beings deserving the same fundamental rights as men. Mary Wollstonecraft argues at length how the politics of exclusion relegating women to domestic duties and the world of beautification and innocence was the result of the

ইংরাজি বিভাগ

theorizing of 18th century reformers and educationists like Rousseau.

Wollstonecraft asserts the rights of women, especially to an education that would render them beings worthy of respect or at least immune to prejudice. Repeatedly she stresses not only equality of the sexes but the right of women to prove this through increased opportunities and independence. Although she provides rational basis for her argument they are in the main founded on religion. In Wollstonecraft's view, the degraded situation of women affronts the God who created men and women in His own image. To trivialize immortal souls through degrading reason becomes a most heinous crime against humanity. Wollstonecraft fuses her rationalism and optimistic Christianity: reason becomes proof of God and of human immortality. She argues from the belief that women possess reason and that this reason emanated from divinity and supports virtue. Although the quantity may vary, it is the same quality in all people. Wollstonecraft went on to argue that segregation of female virtues like sensitivity, intuition and obedience, which were defined as separate from male virtues, specially reason and self-discipline, was false and propagated a system of counterfeit virtues. It also raised questions of whether a woman was capable of rationality and morally responsible behavior. She challenged this kind of argument on the basis "that virtue has only one eternal standard". To say that virtues differ in respect to the female nature was to deny a woman the possession of an immortal soul. Wollstonecraft shows how a woman is told not to indulge in rational or imaginative activities, for they are essentially masculine virtues. A woman must curtail her desires within the narrow domestic space in order to continue engaging the attention of men. Flattered into subjugation, a woman is granted the ability to be child-like and innocent, qualities that Wollstonecraft found specious and fake.

In spite of the existence of reason in everyone, the women whom Wollstonecraft saw around her were certainly in her view inferior to men, both morally and intellectually. Moral inferiority has come from the idea of relative morality so well expressed by Rousseau which considers that women should order their conduct not to align it with absolute ethical standards but to please men. Rousseau's restrictive views are discussed by Wollstonecraft in Chapter V of her *A Vindication* entitled 'Animadversions on Some of the Writers Who have Rendered Women objects of Pity, Bordering of Comtempt'. Besides Wollstonecraft's attack on Rousseau for his sentimental representation of the character of Sophie, the authoress also brings to focus Scottish Presbyterian minister James Fordyce and Scottish physician Dr Gregory for conceptualizing woman fit for child-like innocence, self-beautification and domesticity. In fact Gregory's 'A Father's Legacy to his Daughters' brings to ironic exposure how a father bequeaths his daughters not independence of mind but dependence and restrictive domesticity. Wollstonecraft was also irritated by the views of Lord Chesterfield and Baroness de Stael who wrote a tribute to Rousseau. Such patriarchal views had worked to such an end that reason remained uncultivated in women, while sensibility or emotionalism, had been allowed to grow excessively, to the point where it became lascivious indulgence. Virtue, to which people must aim, is seen as a balance through reason between restraint and emotion. So by concentrating only on emotions, women had been cut off from rational virtue, a quality further obscured for them when female virtue was being defined solely as sexual fidelity. Intellectual inferi-

ority which came from faulty education had turned unnatural any signs of robust thinking in women and has shut them out from any strenuous intellectual pursuits.

Clearly the panacea for women's ills was education. It must however be education with reason, not traditional triviality. Pedagogy was one of the concerns of the century and many debated whether a national education was desirable and feasible. Wollstonecraft looked to the right for education of both sexes since she felt it was the right of all. The universal education she envisioned was limited to the elementary level, after which some should proceed into vocational training according to their sex; the more able and affluent of both genders should continue with their education. She stressed the need for day schools that would complement a loving home. Her brief look at the boarding schools of Eton had convinced her of the viciousness of the boarding system as practiced in England, where it reinforced both class and sex prejudices.

With education suitable for their class, women would, in Wollstonecraft's view, be able to support themselves adequately or fulfill themselves in their traditional role of wife and mother. Properly educated they could prove themselves intellectually and morally equal to men, if they were neglected such equality remained a hypothesis. The need for female education was also a need of society as a whole. Unless the intellectual condition of women improved there could be no further social advancement for humanity. By relating the subjection of women to the subjection of men under an arbitrary authority, Wollstonecraft cleverly brings together women and soldiers. Since both receive a deficient and harmful education, both often display the same characteristics. Both women and soldiers enter the world prematurely, both have superficial knowledge, shallow characters and a love of gallantry.

Before publishing *The Rights of Women*, Wollstonecraft wrote to her friend William Roscoe that she was working on a book in which she herself would appear "head and soul". Both are displayed when she treats the various classes of women - the pampered aristocrat, the middle-class housewife or teacher, and the working woman or outcast. In depicting the middle-class, Wollstonecraft had her own experience to draw on most fully. She had tried many of the routes open to women who could not or would not be dependent on their families. She had been a companion, a schoolteacher, and a governess. In fact she had little to say on the subject of the middle-class woman and employment. She was more concerned with the domestic work, the same possibility of fulfillment as men saw in theirs. If there is one absolute in the book that allows for no contradiction it is the need for reason. Chapter 1 opens with the ringing assertion that humanity's preeminence over animals is reason, and the final chapter ends with impassioned pleas for the rights of reason for women.

There is no doubt that when Mary Shelley came to write her *Frankenstein: A Modern Prometheus* (1816) she inherited in her mother's writings, an entire narrative of 'exclusion', something she could empathize with, given her own anxieties as writer, daughter, wife and mother. Much has been written about the nature of the "troubled heritage" that belonged to Mary, being the daughter of famous parents, and her reading of her mother's writings in the backdrop of her grave, a somber setting for a young girl's education. In consequence, of the three overlapping narratives in *Frankenstein* perhaps the most troubling one belongs to the nameless being that is variously identified as demon, monster and

creature - the result of a botched up experiment conducted in the "workshop of filthy creation". The creature belongs to the realm of nightmare. If we agree with Barbara Johnson that women's writing is essentially autobiographical, then Mary Shelley was giving birth to her "hideous progeny" in the archetypal image of a scary creature reaching out towards his / her absent parent. The monster is not just Frankenstein's double but her own double as well. The story she tells is the making of an imperfect consciousness, a kind of monstrosity that results from 'exclusion' that runs deep in the novel.

In her 1831 'introduction' to *Frankenstein*, Mary Shelley narrates her dream of Frankenstein creating the monster "one dreary November evening" and ends saying "And now, once again, I bid my hideous progeny to go forth and prosper." The monster's narrative is startling as the 'creature' very much like Wollstonecraft's woman, is denied the right of education. According to Wollstonecraft to deny a woman the right to education is to deny her having a soul. Like the women of Wollstonecraft's time, the 'creature' is given no education and the only art he learns is that of pleasing. Encountering himself as a monster he sees the 'self' through the eye of the 'other' just as a woman is taught to see herself through the eyes of men. Erased from history and without a lineage, he can acquire the lessons of life only through experience. The "compelling dream sequence" narrated in the 'introduction' thus provides the framework within which the theme of monstrosity unfolds itself. In fact the 'creature's' femininity is hinted by Mary Shelley in his similarity with Eve in Book 1V of Milton's *Paradise Lost*. Like Maria, in Wollstonecraft's *Maria, or the Wrongs of Woman* (1798), where Wollstonecraft captures the travails of a wronged, demonized woman: the monster is "despised from its birth". Maria's travails in *The Wrongs of Woman* are based on the cultural biases that shape education, specifically women's education. It was as issue that Wollstonecraft had raised at length in *The Rights of Women*, dwelling specifically on education of daughters.

Indeed Sandra M Gilbert and Susan Gubar in their book, *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination* opine that it is debilitating to be a woman in a society where women are warned that if they do not behave like angels they must be monsters. From a male point of view, women who reject the submissive silences of domesticity must be seen as terrible objects - Gorgans, Sirens, Scyllas, serpent-Lamias, Mothers of Death or Goddesses of Night. But from a female point of view the monster woman is simply a woman who seeks the power of self-articulation; and therefore like Mary Shelley giving the first-person story of a monster who seemed to his creator to be merely a "filthy man that moves and talks". Mary Shelley presents this figure for the first time from inside out. We may remember that Mary Wollstonecraft herself was attacked as a "philosophical wanton" and a monster, while her *A Vindication* was called a "scripture, archly framed for propagating w(hores)". As argued earlier woman have seen themselves as monsters even though they have traditionally been defined as angels. "Woman is a temple built over a sewer", said the Church father Tertullian, and Milton seems to see Eve as both temple and sewer, echoing patristic misogyny. Preservation of the hegemonic as pointed out by Gilbert and Gubar is indeed reinforced in the Miltonic epigraph to the title page of Mary Shelley's novel which runs, "Did I request thee, Maker from my clay / To mould me man? Did I solicit thee / From darkness to pro-

mote me?" In 'A Writer's Diary' Virginia Woolf remarks that in Milton "is summed up much of what men thought of 'our' place in the universe, of our duty of God, our religion"; but in *A Room of One's Own* she claims that the woman writer must "look past Milton's bogey", for only then "she will be born".

Indeed in her *Frankenstein* Mary Shelley portrays the consequences of a social construction of gender which values men over women. Victor Frankenstein's 19th century Genevan society is founded on a rigid division of sex-roles: the man inhabits the public sphere, the woman is relegated to the private or domestic sphere. The men in Frankenstein's world all work outside the home as public servants (Alphonse Frankenstein), as scientists (Victor), as merchants (Clerval and his father) or as explorer (Walton). Women on the other hand are confined at home. Elizabeth is not permitted to travel with Victor and "regretted that she had not the same opportunities of enlarging her experience and cultivating her understanding". Inside the home town are either kept as a kind of pet (Victor "loved to tend" on Elizabeth "as I should on a favourite animal") or they work as housewives, child care providers and nurses (Caroline Beaufort Frankenstein, Elizabeth Lavenza, Margaret Saville) or servants (Justine Mortiz). In creating a male creature from dead matter, Frankenstein was perhaps imagining an all male utopia from which he could eliminate reproduction as the female's primary biological function and source of cultural power. Thus it is possible to say that Frankenstein and the monster is one creature, the male egotistical impulse creating its own desolate feminine self and then seeking to destroy it by an act of self-immolation. When the monster demands a female companion much like Milton's Adam, Frankenstein destroys the female counterpart of the artificial man rationalizing that further monstrosity would be let loose on earth if the female survived. More than anything else he is afraid of an independent female will with integrity and desire of its own.

Bibliography:

1. Sandra M Gilbert and Susan Gubar, *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Imagination*, (Yale University Press, New Haven & London, 1979).
2. Maya Joshi (ed.), *Mary Shelley's Frankenstein*, Worldview Publications, Delhi, 2008.
3. Anjana Sharma (ed.), *Frankenstein: Interrogating Gender, Culture and Identity*, Macmillan Critical Readers, Macmillan India Ltd., 2004.
4. Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects* (1792), Wikipedia, https://en.wikipedia. org/wiki

IPL – Is it a Boon or Curse for Indian Cricket

Sidhant Das

India is a country where cricket is more of a religion than a sport. IPL is a cash rich T20 cricket league which is organized in India and contested annually by franchise teams representing Indian cities. This format started from the year 2008. IPL has garnered a lot of support since its inception. It is a format where young players, who are unable to forecast their talent in domestic circuit, are provided an opportunity for performing so that they get selected at the national level. Many talented cricketers have performed throughout the series. Players like Mohit Sharma, Shane Watson and Yusuf Pathan have shone through this format.

IPL has gained popularity since its inception. But is it real cricket? There are tiny boundaries where an untimed shot would yield a six or a four. In ODI cricket or test cricket a technical player can survive. But in IPL even a street player can score 30 to 40 runs out of 10 balls and become a hero. Then what is the difference in IPL and street cricket? A player playing test cricket has to practice rigorously to attain class and technique. But in T20 a player can also get promoted who plays cricket as a hobby. In test cricket a player has to think 10 times before playing a risky shot. But in T20 a batsman is free to hit. So level of skill, technique and temperament is negligible.

So we can say that IPL has destroyed the glory of Indian cricket. Indian players are engrossed in money making and advertisements of their franchises. So they are unable to perform in overseas tournaments. Thus professional cricket in India has been destroyed.

IPL has turned itself into a highly glamorous enterprise which has basterdized the glory of Indian cricket.

Thus we can say that IPL is more of a curse than a boon and Indian cricket should be prevented from losing its real identity.

ছাত্র, অর্থনীতি বিভাগ

College

Arunima Mondal

People say, when you grow up and leave high school to join an undergraduate college you seem to grow wings and usually try to talce flight. Almost every student after stepping into college life, start leading an independent life. No uniforms, no punishments outside class rooms, no morning assemblies. The moment school life comes to an end a golden era of the entire life dies of an eternal sleep. Rightly, people say college gives you an independent yet unscheduled life free from any bondages.

The first day of our college life in the department of Geography was like spending a whole day among a group of strangers all around. Gradually, as days passed by and we drew close of each other, as we all introduced each other, we came to know out backgrounds, each other's school's and our respective past lives. There was never any groups created between us. We firmly believed in the age-old quote, "United we stand, divided we fall." That's where the strength of our batch lies. Well, but still we all do fight with each other on a few instances, misunderstand each other and often misinterpret each others comment's. But the bond we share amongst us keeps us together inspite of all the differences. Perhaps, none of us ever thought that college could bless us with such good friends for a lifetime.

To conclude, we all have numerous bitter-sweet memories which will remain ever lasting. And the best memory was the departmental excursion to Pelling, Sikkim which was conducted from March 13, 2015 to March 19, 2015. And finally ending on a positive note, wishing 'All the very Best' to each one of us for our future.

ছাত্রী, ভূগোল বিভাগ

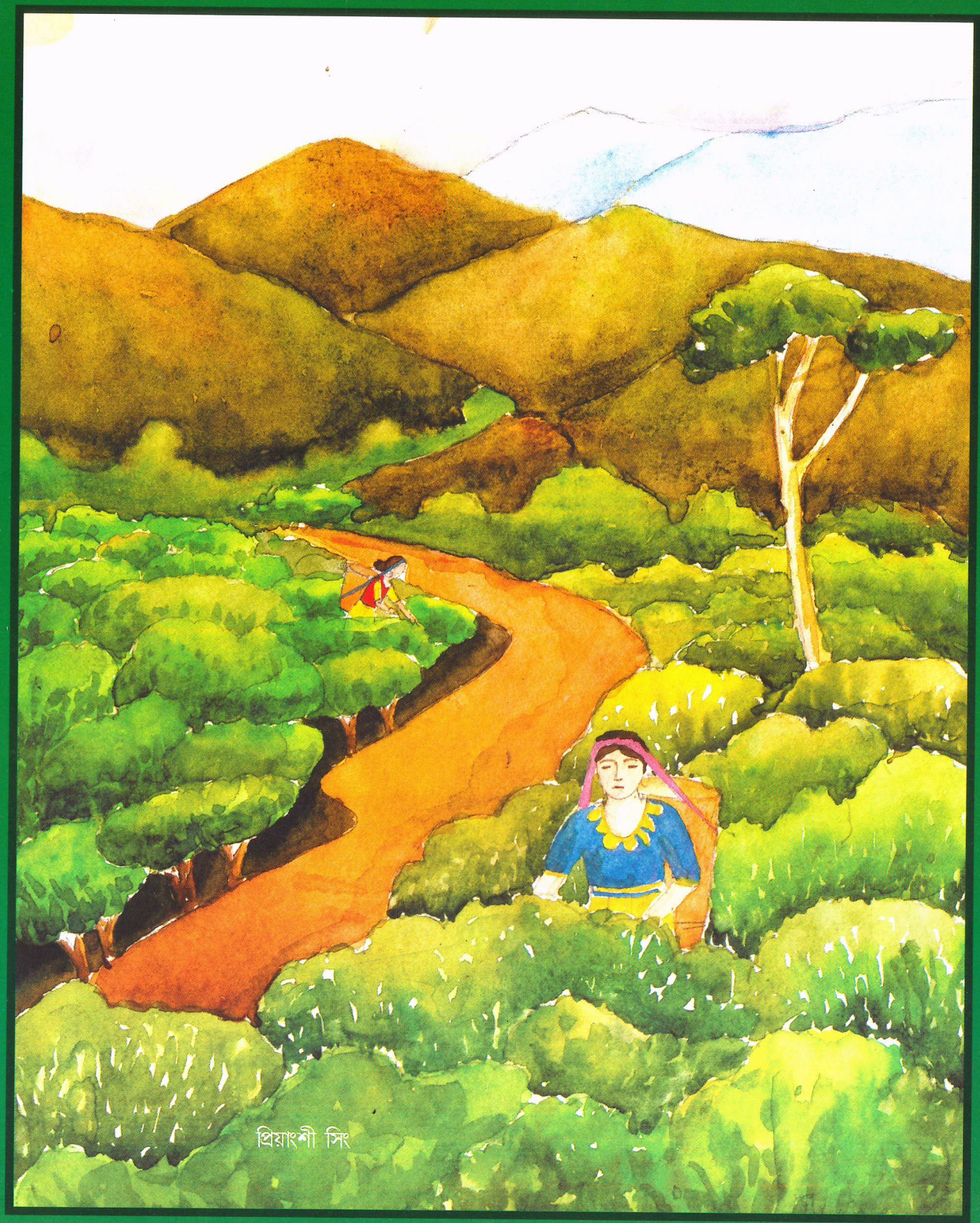
প্রিয়াংশী সিং

সান্তায়ন চক্রবর্তী

হেরম্বচন্দ্র কলেজ ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ ডঃ নবনীতা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, অর্ঘ্যদীপ রায়চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও রমা দত্ত এন্ড কোঃ দ্বারা মুদ্রিত